সাহিত্য দীপিকা



Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI. [Vide Notification No. TB/74/VI/TB/70 and also Board's Letter No. 10367/G, dated 24. 11. 75]

সাহিত্য-দীপিকা

(ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

কলিকাতা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার
প্রাক্তন অধ্যাপক **শ্রীহেরম্বচন্দ্র চক্রবর্তী,** এম. এ.
[বিশ্ববিদ্যালয়-পদক ও বঙ্কিমচন্দ্র-স্বর্ণপদক প্রাপ্ত]

বিদ্যাশ্রী প্রকাশনী
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস, বি. এ.
বিদ্যাশ্রী প্রকাশনী
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ টা. ৪.২৫ মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅজিত কুমার চৌধুরী
সাধনা প্রেস
৬৩-এ, তারিক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
	গদ্যাংশ		
শ্রীরামকৃষ্ণ	—স্বামী বিবেকানন্দ	....	১
রাজা রামমোহন	—শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দাস	....	৫
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	—বিশ্বপতি চৌধুরী	....	৯
চড়ুই ভাতি	—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	....	১৩
দেশাত্মবোধ	—সুভাষচন্দ্র বসু	....	১৯
বৃন্দাবন	—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	....	২৩
শক্তুদাতা ব্রাহ্মণ	—রাজশেখর বসু	....	২৮
বোলপুর ভ্রমণ	—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	....	৩১
এভারেষ্ট অভিযান	—বিশ্বপতি চৌধুরী	....	৩৬
নিউটন	—যোগেশচন্দ্র রায়	....	৪১
স্বদেশ প্রেমের আদর্শ	—বঙ্কিমচন্দ্র	....	৪৫
	পদ্যাংশ		
প্রার্থনা	—রজনীকান্ত সেন	....	৪৯
গুরুভক্তি	—কাশীরাম দাস	....	৫১
সুখ	—কামিনী রায়	....	৫৩
পূজার সাধ	—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	....	৫৫
বঙ্গভূমির প্রতি	—মাইকেল মধুসূদন দত্ত	....	৫৯
বাংলা দেশ	—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	....	৬১
চল্ চল্ চল্	—নজরুল ইসলাম	....	৬৩
মঙ্গল-দূত	—কালিদাস রায়	....	৬৫
ডাকার মতো ডাক	—কুমুদরঞ্জন মল্লিক	....	৬৭
ভীষ্মলোচনের গান	—সুকুমার রায়	....	৬৮
সবার আমি ছাত্র	—সুনির্মল বসু	....	৬৯

সাহিত্য-দীপিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ

[স্বামী বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অসাধারণ মহাপুরুষ। স্বার্থপর লৌকিক বিদ্যা ত্যাগ করিয়া তিনি অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বের মহাশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করেন, নরসেবাকে শ্রেষ্ঠ কর্ম বলেন। তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিলে মানবজাতির পরম কল্যাণ হইবে।]


শ্রীরামকৃষ্ণ

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম ভারতের সর্বত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে সুদূর পল্লীগ্রামে জন্মিয়া এই অশিক্ষিত বালক কেবল নিজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অন্তঃশক্তি বলে সত্য উপলব্ধি করিয়া অপরকে প্রদান করিয়া গেলেন।

ভারতের চারিদিকে যখন নানাবিধ সংস্কার-চেষ্টা হইতেছিল সেই সময় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী, বঙ্গদেশের কোন্ সুদূর গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে একটি বালকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা-মাতা অতি নিষ্ঠাবান্ সেকেলে ধরনের লোক ছিলেন, তাঁহারা খুব

দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু অনেক সময় কোন দরিদ্র অতিথিকে খাওয়াইতে গিয়া গৃহিণী সারাদিন উপবাস করিতেন। এইরূপ পিতামাতা হইতে এই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন। অল্পবয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি পাঠশালায় প্রেরিত হন।

অল্পদিন পরে তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল যে, সমুদয় লৌকিক বিদ্যার উদ্দেশ্য কেবল সাংসারিক উন্নতি। সুতরাং তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণে সম্পূর্ণরূপে জীবন সমর্পণ করিতে সংকল্প করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সংসারে প্রবল দারিদ্র্য আসিল, এই বালককে নিজের আহার সংস্থানের চেষ্টা করিতে হইল। তিনি কলিকাতার সন্নিকটে একটি স্থানে যাইয়া তথাকার মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হইলেন। মন্দিরে আনন্দময়ী মাতার একটি মূর্তি ছিল। এই বালককে প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে তাঁহার পূজা নির্বাহ করিতে হইত। এইরূপ করিতে করিতে এক ভাব আসিয়া তাঁহার মনকে অধিকার করিল—"এই মূর্তির ভিতর কিছু বস্তু আছে কি? ইহা কি সত্য যে জগতে এই আনন্দময়ী মা আছেন, এসব স্বপ্নতুল্য মিথ্যা"—বালকের হৃদয়ে এই ধারণা প্রবেশ করিলে, তাঁহার সারাদিন কেবল এই ভাবনা—কিসে প্রত্যক্ষ দর্শন হইবে।

তাঁহার জীবনের এই ভাব সম্বন্ধে তিনি অনেকবার বলিয়াছেন, 'কখন সূর্য উদয় হইল, কখন বা অস্ত গেল, তাহা আমি জানিতে পারিতাম না।' মনুষ্য-হৃদয়ে এইরূপ ব্যাকুলতা আসিয়া থাকে। দিবাবসানে সন্ধ্যাকালে যখন মন্দিরের আরতি শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইতেন, তাঁহার মন তখন অতিশয় ব্যাকুল হইত। এইরূপে দিনের পর দিন, সপ্তাহের 'পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সত্যলাভের জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টায় কাটিল। তখন তিনি নানাবিধ অলৌকিক দৃশ্য, অদ্ভুত রূপ দেখিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার নিজ স্বরূপের রহস্য

তাঁহার নিকট ক্রমশঃ উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল, যেন আবরণের পর আবরণ অপসারিত হইতে লাগিল।

সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই অপূর্ব মানুষকে দেখিতে, তাঁহার সরল গ্রাম্য ভাষায় উপদেশ শুনিতে আসিতে লাগিল। তিনি যাহা বলিতেন, তাহার প্রত্যেক কথাতেই একটি শক্তি মাখান থাকিত, প্রত্যেক কথাই হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিয়া দিত।

তাঁহার জীবনে আদৌ বিশ্রাম ছিল না। তাঁহারজীবনের প্রথমাংশ ধর্ম উপার্জনে ও শেষাংশ উহার বিতরণে ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহার মানবজাতির প্রতি এইরূপ অগাধ প্রেম ছিল যে, যাহারা তাঁহার কৃপালাভার্থ আসিত, এরূপ সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি সামান্য ব্যক্তিও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হইত না। মাসের পর মাস এরূপ হইতে লাগিল—অবশেষে এরূপ কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রমে তাঁহার গলায় একটি ঘা হইল, তথাপি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া কথা বন্ধ করা গেল না।

একদিন তিনি আমাদিগকে সেইদিন দেহত্যাগ করিবেন ইঙ্গিতে জানাইলেন এবং বেদের পবিত্রতম মন্ত্র 'ওঁ' উচ্চারণ করিতে করিতে মহাসমাধিস্থ হইলেন। এইরূপে সেই মহাপুরুষ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এই যুগে এইরূপ ব্যক্তির আবশ্যক। কোন দেশে এইরূপ ব্যক্তির যতই অভ্যুদয় হইবে, ততই সেই দেশ উন্নত হইবে। আর যে দেশে এইরূপ ব্যক্তি একেবারে নাই সে দেশের পতন অনিবার্য, কিছুতেই উহার উদ্ধারের আশা নাই। ত্যাগ ও প্রত্যক্ষানুভূতির সময় আসিয়াছে; অতএব জগতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে তাহা দেখিতে পাইবে, বুঝিবে—বিবাদের কোন প্রায়োজন নাই আর তখনই সমগ্র মানবজাতির সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে পারিবে।

মদীয় আচার্যদেবের জীবনের ইহাই উদ্দেশ্য—সকল ধর্মের মধ্যে যে মূলে ঐক্য রহিয়াছে, তাহা ঘোষণা করা। —স্বামী বিবেকানন্দ

(ঈষৎ পরিবর্তিত)

অনুশীলনী

১। 'শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটি অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনা কর।

২। রামকৃষ্ণের জীবনে কিভাবে ভক্তির উদ্রেক হইল ?

৩। বর্তমানে রামকৃষ্ণের ন্যায় ব্যক্তির প্রয়োজন কেন ; তাঁহার জীবনের প্রধান শিক্ষা কি ?

৪। অর্থ লিখ :—

নিষ্ঠাবান, জ্ঞানান্বেষণ, সন্নিকটে, সায়াহ্নে, অলৌকিক, আদৌ, অভ্যুদয়, অনিবার্য, প্রত্যক্ষানুভূতি, সংস্কার-চেষ্টা, মদীয়।

৫। ব্যাখ্যা লিখ : তিনি যাহা·········দূর করিয়া দিত।

৬। নিম্নের শব্দগুলির প্রত্যেকটি দ্বারা বাক্য রচনা কর :—

সুদূর, সংকল্প, স্বপ্নতুল্য, ব্যাকুল, অবিশ্রান্ত, অদ্ভুত, অগাধ।

৭। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—গ্রামাঞ্চলে, জ্ঞানান্বেষণ, উপার্জন, শেষাংশ।

৮। শুদ্ধ বানানে লিখ :– পুরহিত, মূর্তী, অতিসয়, অদ্ভূত, জাতী, ঘোষণা।

৯। লিঙ্গ পরিবর্তন কর :—বালক, গৃহিণী, ব্রাহ্মণ, আনন্দময়ী, মানব।

Biography of Sri Ramkrishna helping in mental development.

রাজা রামমোহন


রামমোহন

[রামমোহন বাল্যকাল হইতেই পৌত্তলিক-বিরোধী। হিন্দুর আচার-নিষ্ঠা ত্যাগ করিলেও তিনি সমাজের উপকার করিয়া যশ অর্জন করেন। তিনি শৈশবেই আরবী ও পারসী শিখেন, পরে ইংরাজীও শিখেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন, সতীদাহ নিবারণ করেন। তিনি ছিলেন স্বাধীনতাপ্রিয় স্বদেশ-প্রেমিক। আধুনিক বাঙ্গালী সমাজের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা।]

হুগলী জেলায় রাধানগর নামে একটি গ্রাম আছে। গ্রামটি ছোট্ট এবং তথায় মুষ্টিমেয় লোকের বাস। এই নিভৃত পল্লীতে রামমোহনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায় এবং মাতার নাম তারিণী দেবী। তখন মুর্শিদাবাদের নবাবদের বড় নাম-ডাক। রামকান্ত রায় মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে কাজ করিতেন। তিনি উচ্চ-পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং রামমোহনকে ছোটবেলায় অর্থের অভাব বোধ করিতে হয় নাই। সচ্ছলতার মধ্যেই তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

তখন সবেমাত্র এদেশে ইংরাজশাসন শুরু হইয়াছে। আরবী ও পারসী ভাষার তখনও প্রচুর সমাদর। পাঁচ বৎসর বয়সে বালক রামমোহনের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি বাংলা ভাষার সঙ্গে আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার মেধাশক্তি ছিল অসাধারণ। যাহা একবার পড়িতেন, তাহা আর ভুলিতেন না, অনর্গল

বলিতে পারিতেন। রামমোহনের বয়স যখন সবেমাত্র নয় বৎসর, তখন আরবী ও পারসী ভাষা ভালভাবে শিখিবার জন্য তাঁহাকে পাটনা শহরে পাঠান হইল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি উভয় ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন।

তারপর সংস্কৃত শিখিবার জন্য তিনি কাশীধামে গেলেন। তখন সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল কাশীধাম। তিনি কাশীধামে যাইয়া সংস্কৃত ভাষা শিখিলেন এবং নানা হিন্দুশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিলেন। চারিদিকে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। তখন তাঁহার বয়স সবে মাত্র ষোল বৎসর।

এই সময়ে হিন্দুসমাজে বহু কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছিল। ধর্ম অপেক্ষা সংস্কারকে লোকে বড় মনে করিত। তিনি হিন্দুসমাজের মূর্তি পূজার এবং রাজনীতির বিরোধী হইয়া উঠিলেন। দেশে ফিরিয়া রামমোহন নিজের ধর্মবিশ্বাস প্রচার করিতে লাগিলেন। পিতা রামকান্ত তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু রামমোহন যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, ঐ পথ হইতে বিচ্যুত হইবার লোক ছিলেন না। অবশেষে পিতা রামকান্ত তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

কিছুদিন পরে রামমোহনের পিতার মৃত্যু হয়। পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া রামমোহনকে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে একটি চাকরি গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু কয়েক বৎসর পর তিনি এই সরকারী চাকরি ছাড়িয়া দিলেন।

এইবার তাঁহার কর্মময় জীবনের সূত্রপাত হইল। তিনি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মবিষয়ে অধিক মনোযোগ দিলেন। তিনি "ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়," এই ধর্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রচারিত এই ধর্মমত ব্রাহ্মধর্ম নামে পরিচিত।

রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেন। অবশেষে আইন করিয়া ইহা বন্ধ করা হইল। রামমোহনের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তাননিক্ষেপ প্রভৃতি জঘন্য প্রথার বিলোপ সাধন ঘটিল।

রামমোহন দেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহার জন্মভূমি ইংরাজের অধীন, ইহাতে তিনি বড়ই ব্যথিত হইতেন। কোন দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে শুনিলে তাঁহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত। রামমোহন বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। জাহাজে পড়িয়া গিয়া তাঁহার পা ভাঙিয়া গিয়াছে। জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছিয়াছে। সেখানে তিনি দেখিলেন, ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড়িতেছে। তখন তিনি ভাঙা পা লইয়াই ফরাসী জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিলেন। আসিবার সময় ফরাসীদেশের জয়-ধ্বনি করিতে করিতে আসিলেন। কি স্বাধীনতাপ্রিয়তা!

রামমোহন বুঝিয়াছিলেন, এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন না হইলে দেশের উন্নতি হইবে না। তাই তিনি ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। অবশেষে তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হইল।

তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল। শাহ আলম নামেমাত্র দিল্লীর সম্রাট। তিনি ছিলেন কোম্পানীর বৃত্তিভোগী। বাদশাহের সঙ্গে কোম্পানীর গোলমালের সৃষ্টি হইলে রামমোহন বাদশাহের তরফে বিলাত গমন করেন। বাদশাহ তাঁহাকে এসময় 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সমুদ্র পার হইয়া বিলাত গমন করেন। বিলাতে তিনি অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় দেন। বিলাত হইতে তিনি ফরাসী দেশে গমন করেন, আবার বিলাতে ফিরিয়া আসেন। চারিদিকে তাঁহার বিজয় গৌরব ছড়াইয়া

পড়িল। কিন্তু স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইল না। বিলাতে ব্রিষ্টল শহরে প্রাচ্যের এই গৌরবময় জীবনের অবসান ঘটিল।

—শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দাস

অনুশীলনী

১। রামমোহনের পিতা রামমোহনকে কেন বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন ?

২। রামমোহনের সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। রামমোহনের স্বাধীনতা-প্রিয়তার কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

৪। অর্থ লিখ :—

সতীদাহ প্রথা, মুষ্টিমেয়, খ্যাতি, বিচ্যুত, বৃত্তিভোগী, উত্তমাশা।

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

ভারতীয়দের — তিনি — সমুদ্র — হইয়া — গমন —।

৬। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) কিন্তু স্বদেশে……অবসান ঘটিল।

৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রত্যেকটি দ্বারা এক-একটি বাক্য রচনা কর :

সবেমাত্র, নামেমাত্র, সূত্রপাত, জঘন্য, অভিবাদন, আমল, তরফ।

৮। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—যথেষ্ট, উত্তমাশা, উপাধি।

Biography of Rammohan Roy.
Teaches fighting against superstitions and evil customs of the society.

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

[প্রফুল্লচন্দ্র রসায়ন শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করিয়া সুবিখ্যাত অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি নহে, তিনি ছিলেন স্বদেশ-প্রেমিক সমাজসেবী। তিনি বাঙ্গালীর আর্থিক উন্নতির জন্য শিল্প-ব্যবসায়ে উৎসাহ দিয়াছেন, দুর্গতের সেবায় আত্মদান করিতে শিখায়াইছেন। পাণ্ডিত্য ও মানবতার মিশ্রণে তিনি ছিলেন অসাধারণ।]



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

প্রফুল্লচন্দ্রের কথা উঠিলেই মনের মধ্যে আপনা হইতেই প্রশ্ন জাগে—বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্রকে আমরা অধিক শ্রদ্ধা করি, না মানবপ্রেমিক, দেশপ্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্রকে অধিক শ্রদ্ধা করি? তাঁহার অসাধারণ মনীষা ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আমাদের অধিক চমৎকৃত করে, না তাঁহার অপূর্ব চরিত্র-মাধুর্য আমাদের অধিক মুগ্ধ করে?

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলার অন্তর্গত রাড়ুলী নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-পরিবারে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী পরোপকারী সদাশয় ব্যক্তি। তিনি নিজ গ্রামে একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্কুলেই প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষা আরম্ভ হয়। এখানকার পড়া শেষ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন।

স্কুলের পড়া শেষ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 'গিলক্রাইষ্ট' বৃত্তি লাভ করিয়া বিজ্ঞান-বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত গমন করেন। সেখানে তিনি সুদীর্ঘ ছয় বৎসরকাল এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস্-সি. উপাধি অর্জন করিয়া অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

দেশে ফিরিয়া প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি দিবারাত্র নানারূপ রাসায়নিক গবেষণায় নিজেকে আকণ্ঠ নিমগ্ন করিয়া রাখিতেন। এই সকল গবেষণার মধ্যে তাঁহার পারদ-সম্বন্ধীয় গবেষণাই তাঁহাকে জগদ্বিখ্যাত করিয়াছে। তাঁহার রচিত 'হিন্দু-রসায়নের ইতিহাস' নামক বিরাট গ্রন্থখানিও তাঁহার এক অপূর্ব কীর্তি।

প্রফুল্লচন্দ্র শুধু একজন আদর্শ বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন আদর্শ গুরু ও আদর্শ অধ্যাপক। তিনি শুধু ছাত্রদের শিক্ষাদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্ব সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, বিজ্ঞান-সাধনা ব্যতীত বর্তমান যুগে কোন জাতি বড় হইয়া উঠিতে পারে না। তাই ছাত্রদের মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞান-সাধনার আকাঙ্ক্ষা ও স্পৃহা জাগিয়া উঠে, সেদিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি জানিতেন, মানব-জীবন চিরস্থায়ী নয়; তাই তাঁহার মৃত্যুর পরও যাহাতে তাঁহার বিজ্ঞান-সাধনার ধারা অব্যাহত থাকে, সেজন্য তিনি তাঁহার প্রিয় ছাত্রদের লইয়া একটি বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত সাধনা ও চেষ্টায় আজ বাংলাদেশে যে সকল বৈজ্ঞানিকের উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার আজ জগতের বিশ্বজনসমাজে বিশেষভাবে আদৃত। তাঁহার

হাতে-গড়া শিষ্য মেঘনাদ সাহা, নীলরতন ধর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আজ ভারতবর্ষের সীমা ছাড়াইয়া সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকা পর্যন্ত ছড়াইয়া গিয়াছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শুধু বিজ্ঞান-সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন নাই। বাংলাদেশ যাহাতে শিল্পে ও ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারে, সেজন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' নামক যে বিরাট কারখানা এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি আজ বাংলাদেশের গৌরবস্থল হইয়া উঠিয়াছে, প্রফুল্লচন্দ্রই তাহার প্রতিষ্ঠাতা।

শুধু জ্ঞান ও শিল্পক্ষেত্রেই নয়, জনসেবার পুণ্যক্ষেত্রেও প্রফুল্লচন্দ্রের সাধনা ও কর্মশক্তি সমভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দেশে যখনই কোথাও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, বন্যায় কোন অঞ্চল যখনই প্লাবিত হইয়াছে, তখনই আচার্যদেব সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া দুর্গতদের সেবায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; দুর্গতদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী পাঠাইয়া এবং নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তাহাদের সেবা করিয়া মানবপ্রীতির চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে আচার্যদেবের বিচিত্র কর্মময় জীবনের অবসান হয়। তাঁহার তিরোধানে বাঙালী শুধু একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককেই হারাইল না, সেই সঙ্গে হারাইল একজন সত্যকার হিতাকাঙ্ক্ষী মহা-প্রাণ বন্ধু ও নেতাকে। প্রফুল্লচন্দ্র আজ আর নাই; কিন্তু তাঁহার পুণ্যস্মৃতি বাঙালীর অন্তরে চিরদিন অম্লান হইয়া থাকিবে।

—বিশ্বপতি চৌধুরী

Biography of Acharya Prafulla Ch
helping in mental developmen
It describes him as a scientist
as well asasocial worker.

অনুশীলনী

১। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কে ছিলেন? জাতির জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। অর্থ লিখ :—

বৈজ্ঞানিক, মানবপ্রেমিক, মনীষী, গবেষণা, জগদ্বিখ্যাত, চিরস্থায়ী, পাণ্ডিত্য, প্রতিষ্ঠাতা, স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী।

৩। টীকা লিখ :—

হেয়ার স্কুল, গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি, বেঙ্গল কেমিক্যাল।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি দ্বারা এক-একটি বাক্য রচনা কর :—

বিশ্ববিশ্রুত, মুগ্ধ, সদাশয়, দিবারাত্র, নিমগ্ন, আকাঙ্ক্ষা, অব্যাহত, আত্মপ্রকাশ, বিচিত্র, হিতাকাঙ্ক্ষী।

৫। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি হইতে বিশেষণ পদ বাহির কর :—

এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী, পরোপকারী, সদাশয় ব্যক্তি।

৬। নিম্নের বাক্যটি হইতে বিশেষ্য পদ বাহির কর :—

প্রফুল্লচন্দ্র শুধু একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন আদর্শ গুরু ও আদর্শ অধ্যাপক।

৭। লিঙ্গ পরিবর্তন কর :—

অধ্যাপক, গুরু, সদাশয়, পরোপকারী, শিষ্য।

৮। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

গবেষণা, পরোপকারী, বিদ্যোৎসাহী, সদাশয়, উন্নতি।

৯। ব্যাখ্যা লিখ :—

তাঁহার তিরোধানে……নেতাকে।

চড়ুই-ভাতি

[অপু নামে একটি বালক এবং তার দিদি দুর্গা—একটি কিশোর এবং একটি কিশোরী চড়ুই-ভাতি করিবার জন্য বাহির হইয়াছে। এইরূপ বনভোজন করিতে বাহির হইয়া তাহারা মুক্তির আনন্দ—বিশাল বিচিত্র সুন্দর পৃথিবীর সহিত পরিচয়ের আনন্দ লাভ করিয়াছে। এতকাল এই দুইটি বালক-বালিকা ধুলার ভাত, খাপরার আলুভাজা ও কাঁঠাল-পাতার লুচি তৈয়ারী করিয়া রান্না-খাওয়ার কৃত্রিম আনন্দ পাইয়াছে। আজ সত্যিকারের ভাত-তরকারি রাঁধিয়া খাইয়া তাহাদের উল্লাসের অবধি নাই। শিশু-মনের আর একটি বিশেষত্ব এই চড়ুইভাতিকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। শিশু জাতিভেদের সমস্যা বুঝে না, অস্পৃশ্যতার বিষবাষ্প শিশু-মনকে অধিকার করতে পারে না। তাই নীচু বামুন ঘরের মেয়ে বিনিকে অপু ও দুর্গা দুইজনে অকপটে চুমুক দিয়া তাহাদের গ্লাস হইতে জলপান করিতে বলিয়াছে। শিশুর মত এইরূপ অকপট ভালবাসা থাকিলে আমাদের দেশে অস্পৃশ্যতা-সমস্যার সমাধি-রচনা সহজেই হইতে পারে।]

সেদিন অপুর দিদি তাহার ছোট ভাইটিকে কাছে টানিয়া চুপি চুপি বলিল, "চড়ুই-ভাতি করবি অপু?"

তাহাদের দোর দিয়া পাড়ার সকলে কুলুই-চণ্ডীর ব্রতের বন-ভোজনে গ্রামের পিছনের মাঠে যায়। তাহার মাও যায়, কিন্তু তাহাদের লইয়া যায় না।

নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওধারের খানিকটা বন দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া তাহার ভাইকে বলিল,—দাঁড়িয়ে ছাখ্ অপু তেঁতুলতলায়, মা আসছে কিনা—আমি চাল বের ক'রে নিয়ে আসি শিগ্‌গির করে—

দুর্গা একটা ভাল নারিকেলের মালায় দুই পলা তেল নেয় চুপি চুপি তেলের ভাঁড়টা হইতে। অপহৃত জিনিষপত্র বাহিরে আনিয়া

ভাইয়ের জিম্মা করিয়া দুর্গা বলিল,—শিগ্‌গির নিয়ে যা, দৌড়ো অপু —সেই খানে রেখে আয়, দেখিস্! যেন গরু-টরুতে খেয়ে ফেলে না—

চারিদিক বনে ঘেরা। বাহির হইতে দেখা যায় না। খেলাঘরের মাটির ছোবার মত ছোট্ট একটা হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল, এই ছাখ অপু, কত বড় বড় মেটে আলুর ফল নিয়ে এসেছি এক জায়গা থেকে। পুঁটুদের তালতলায় একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে, ভাতে দেবো—

অপু মহা উৎসাহে শুক্‌না লতা-পাতা কুড়াইয়া আনে। এই তাহাদের প্রথম বন-ভোজন। অপুর এখনও বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এখানে সত্যিকারের ভাত-তরকারি রান্না হইবে, না, খেলাঘরের বন-ভোজন, যা কতবার হইয়াছে, সেরকম হইবে,—ধূলার ভাত, খাপরার আলুভাজা, কাঁঠাল-পাতার লুচি?

বড় সুন্দর বেলাটি! বড় সুন্দর স্থান বন ভোজনের! চারিধারে বনঝোপ, ওদিকে তেলাকুচা-পাতার দুলুনি, বেল গাছের তলে জঙ্গলে সেওড়াগাছে ফুলের ঝাড়, আধপোড়া কটা দূর্বা-ঘাসের উপর খঞ্জন পাখীরা নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জন ঝোপঝাড়ের আড়ালে নিভৃত নিরালা স্থানটি। প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে ঝোপে নতুন কচি পাতা, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটেটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে, বাতাবিলেবু গাছটায় কয়দিনের কুয়াসায় ফুল অনেক ঝরিয়া গেলেও থোপা-থোপা সাদা সাদা ফুল উপরের ডালে চোখে পড়ে।

চড়ুই-ভাতির মাঝামাঝি অপুদের বাড়ীর উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল। দুর্গা বলিল,—বিনির গলা যেন—নিয়ে আয় তো ডেকে অপু! একটু পরে অপুর পিছনে পিছনে দুর্গার সমবয়সী একটি কালো মেয়ে আসিল,—একটু হাসিয়া যেন কতকটা সম্ভ্রমের সুরে বলিল,—কি হচ্ছে দুগ্‌গা দিদি?

দুর্গা বলিল,—আয় না বিনি, চড়ুই-ভাতি কচ্চি—বোস্—

মেয়েটি ওপাড়ার কালীনাথ চক্কত্তির মেয়ে—পরনে আধময়লা জামা, হাতে সরু সরু কাঁচের চুড়ি, একটু লম্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত সাদাসিধা। তাহার বাপ নীচু বামন বলিয়া সামাজিক ব্যাপারে পাড়ায় তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় না, গ্রামের একপাশে নিতান্ত সঙ্কুচিত-ভাবে তাহারা বাস করে। অবস্থাও ভাল নয়। বিনি দুর্গার ফরমাইস খাটিতে লাগিল। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা তাহাকে এই উৎসবের অংশীদার স্বীকার করিবে কি না করিবে—এরূপ একটা দ্বিধামিশ্রিত উল্লাসের ভাব তাহার কথাবার্তায় ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছে। দুর্গা বলিল,—বিনি, আর দুটো শুকনো কাঠ ছাখ্‌তো—আগুনটা জ্বলছে না ভাল—

বিনি তখনি কাঠ আনিতে ছুটিল, এবং একটু পরে এক বোঝা শুক্‌না বেলের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল,—এতে হবে দুগ্‌গা দিদি—না, আরও আনবো? দুর্গা যখন বলিল,—বিনি এসেছে ও-ও তো এখানে খাবে—আর দু'টো চাল নিয়ে আয় অপু—বিনির মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।—খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—কি কি তরকারি, দুগ্‌গা দিদি?

ভাত নামাইয়া দুর্গা তেলটুকু দিয়া বেগুন ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে ডাকিয়া বলে,—ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন ভাজার মত রঙ হচ্ছে দেখচিস্ অপু! ঠিক যেন মা'র বেগুন-ভাজা, না?

অপুরও ব্যাপারটা আশ্চর্য বোধ হয়। তাহার এখনও যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে, তাহাদের বন-ভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার

বেগুন-ভাজা সম্ভবপর হইবে। তাহার পর তিনজনে মহা-আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে, শুধু ভাত আর বেগুন-ভাজা, আর কিছু ছিল না। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা সেদিকে চাহিয়াছিল, আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে,—কেমন হয়েছেরে বেগুন-ভাজা?



চড়ুই-ভাতি

অপু বলে,—বেশ হয়েছে দিদি, কিন্তু নুন হয়নি যেন—

লবণকে রন্ধনের উপকরণের তালিকা হইতে ইহারা অদ্য একেবারেই বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহাখুশিতে তিনজনে কোযো আলুর ফল-ভাতে ও পানসে আধ-পোড়া বেগুন-ভাজা দিয়া চড়ুই-ভাতির ভাত খাইতে বসিল। দুর্গার এই প্রথম রান্না, সে বিস্ময়-মিশানো আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিল্প-সৃষ্টি উপভোগ করিতেছিল। এই বন-ঝোপের মধ্যে, এই শুক্‌নো আতাপাতার রাশের মধ্যে, খেজুর তলায় ঝরিয়া-পড়া খেজুর পাতার পাশে বসিয়া সত্যিকারের ভাত-তরকারি খাওয়া!

খাইতে খাইতে দুর্গা অপুর দিকে চাহিয়া হি হি করিয়া খুশির হাসি হাসিল। খুশিতে ভাতের দলা তাহার গলার মধ্যে আটকাইয়া যাইতেছিল যেন। বিনি খাইতে খাইতে ভয়ে ভয়ে বলিল,—একটু তেল আছে দুগ্‌গাদি'? মেটে আলুর ফল ভাতে মেখে নিতাম। দুর্গা বলিল,—অপু, ছুটে নিয়ে আয় একটু তেল—

যে জীবন কতশত পুলকের ভাণ্ডার, কত আনন্দ-মুহূর্তের আলো-জ্যোৎস্নার আবেদনে মণ্ডিত, ইহাদের সে মাধুরীময় জীবনযাত্রার সবে তো আরম্ভ! অনন্ত যে-জীবনপথ দূর হইতে বহুদূরে দৃষ্টির কোন্ ওপারে বিসর্পিত, সে-পথের ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পথিকদল, পথের বাঁকে ফুলে-ফলে, দুঃখে-সুখে ইহাদের অভ্যর্থনা একেবারে নূতন।

অনন্দ! আনন্দ! প্রসারের আনন্দ, জীবনের মাঝে মাঝে যে আড়াল আছে, বিশাল তুষারমৌলি গিরিসঙ্কটের ওদিকের যে পথটা দেখা যাইতেছে না—তাহার আনন্দ অজানার আনন্দ! সামান্য সামান্য, ছোটখাটো তুচ্ছ জিনিষের আনন্দ!

অপু বলিল,—মাকে কি বলবি দিদি? আবার ওবেলা ভাত খাবি?

দূর, মাকে কখনো বলি! সন্ধ্যের পর দেখিস, খিদে পাবে 'খন।....বিনিরা নীচু বামন বলিয়া পাড়ায় জল খাইতে চাহিলে লোকে উহাদের ঘটিতে করিয়া জল খাইতে দেয়; তাহাও আবার মাজিয়া দিতে হয়। বিনি দু'একবার ইতস্ততঃ করিয়া অপুর গ্লাসটা দেখাইয়া বলিল,—আমার গলায় একটু জল ঢেলে দেও অপু! জলতেষ্টা পেয়েছে। অপু বলিল,—নাও না, বিনি-দি', তুমি নিয়ে চুমুক দিয়ে খাও না।

তবু যেন বিনির সাহস হয় না। দুর্গা বলিল,—নে না বিনি, গেলাসটা নিয়ে খা না।

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে দুর্গা বলিল,—হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর-একদিন বন-ভোজন করবো—কেমন তো। ওই কুলগাছটার ওপর টাঙিয়ে রেখে দেবো।

অপু বলিল,—হ্যাঁ, ওখানে থাকবে কিনা? মাতোর মা কাঠ কুড়োতে আসে, দেখতে পেলে নিয়ে যাবে, দিদি—ভারি চোর—একটা ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে ছোবাটা দুর্গা রাখিয়া দিল।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

Famous literary piece taken from "Pather Panchali" of Bibhuti Bandopadhyaya. Pupils will enjoy the story and learn that none is to be hated.

অনুশীলনী

১। অপু-দুর্গার চড়ুই-ভাতির আনন্দোল্লাস বর্ণনা কর।

২। চড়ুই-ভাতি উপলক্ষ্য করিয়া অপু-দুর্গার উদার মনের যে-পরিচয় পাইয়াছ, বল।

৩। অর্থ বল :—

অপহৃত, জিম্মা, নির্জন, দ্বিধামিশ্রিত, উল্লাস, ইতস্ততঃ, বিসর্পিত, তুষারমৌলি, কুড়োতে।

৪। ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) যে জীবন······নূতন।

(খ) তবু যেন বিনির······খা না।

৫। নিম্নের প্রত্যেকটি শব্দ দ্বারা একটি বাক্য গঠন কর :—

ঘেরা, ছোট্ট, উৎসাহ, নিভৃত, বনভোজন, আধ-পোড়া, মাধুরীময়, তেষ্টা।

৬। চলিত হইতে সাধু এবং সাধু হইতে চলিত ভাষায় রূপান্তর কর :—

(ক) দাঁড়িয়ে ছাখ্ অপু তেঁতুলতলায়, মা আসছে কিনা—আমি চাল বের করে নিয়ে আসি শিগ্‌গির করে।

(খ) খাইতে খাইতে দুর্গা অপুর দিকে চাহিয়া হি হি করিয়া খুশির হাসি হাসিল।

দেশাত্মবোধ

[নেতাজী সুভাষচন্দ্র দেশকে আপন বলিয়া ভাবিতেন এবং জাতিকে সেই শিক্ষাই দিয়াছেন। বাংলার সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। দেশের সেবায় তিনি আত্মদান করিয়াছিলেন। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তিনি চরম দুঃখ বরণ করিয়াছিলেন। স্বরাজ লাভের সাধনাই ছিল তাঁহার জপ-তপ। জাতিকে তিনি সেই শিক্ষাই দিয়াছেন।]

সুযোগ থাকিলে ও সম্ভবপর হইলে আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জাতীয় সমস্যা বিষয়ে আমার সকল মতামত আপনাদের নিকট নিবেদন করিতাম এবং আপনাদের উপদেশ ও পরামর্শ শুনিতে চাহিতাম। কিন্তু সে অধিকার হইতে আমি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি। প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল আমি বিনা-বিচারে ও বিনা-অপরাধে কারারুদ্ধ। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমাকে গভর্ণমেণ্টের কোনও আদালতের সামনে উপস্থিত করা হয় নাই। এমন কি, আমার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কি অভিযোগ ও সাক্ষ্য আছে তাহাও প্রকাশ্যে অথবা জনান্তিকে আমাকে বলা হয় নাই। আমার অপরাধ সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, অপরাধ যদি কিছু করিয়া থাকি তাহা এই যে, পরাধীন জাতির সনাতন গতানুগতিক জীবনপন্থা ছাড়িয়া কংগ্রেসের একজন দীন সেবক হিসাবে স্বদেশ-সেবায় মন-প্রাণ-শরীর সমর্পণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তারপর আমি যে শুধু কারারুদ্ধ হইয়াছি তাহা নয়, বিশ মাস হইল আমি দেশান্তরিত। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জলের পবিত্র স্পর্শ হইতে কতকাল যাবৎ আমি বঞ্চিত ; তবে আমার সান্ত্বনা ও সৌভাগ্য এই যে, আমার কারাবাস ব্যর্থ হয় নাই। আজ "আমার

সকল ব্যথা রঙীন হয়ে, গোলাপ হয়ে" ফুটিয়াছে এইখানে। আসিবার পূর্বে আমি বাঙ্গলাকে, ভারতভূমিকে ভালবাসিতাম। কিন্তু বিচ্ছেদের দরুন সোনার বাঙ্গলাকে, পুণ্য ভারতভূমিকে শতগুণে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস—"স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা"। বাঙ্গলার মোহনীয় রূপ আজ আমার নিকট কত পবিত্র, কত সুন্দর হইয়াছে। যে চিরন্তন সত্য বাঙ্গলার ভাগীরথীর ও বাঙ্গলার ঢেউ-খেলানো শ্যামল শস্যক্ষেত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গলার যে প্রাণধর্মকে বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া দেশবন্ধু পর্যন্ত প্রতিভাবান মনীষিগণ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়া সাহিত্যের মধ্যে প্রকট করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার যে বিচিত্র রূপ কত শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকের লেখনী ও তুলিকার বিষয় হইয়াছে, আজ তাহার আভাস পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। তাই অনুভূতির পুণ্য প্রভাবে আমার দুই বৎসর কারাবাস সার্থক হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, এহেন মায়ের জন্য দুঃখ ও বিপদ বরণ করা কত গৌরবের, কত সৌভাগ্যের কথা।

এইরূপ নিবেদনে নিজের পরিচয় দেওয়া একটা রীতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আমার এমন কোনও সম্বল বা সম্পদ নাই যাহার উল্লেখ করিয়া আমি আপনাদের সহায়তা দাবী করিতে পারি। পাঁচ বৎসর পূর্বে যখন উচ্ছল জলধিতরঙ্গের ন্যায় উদ্বেলিত ভারতবাসীর প্রাণ দেশমাতৃকার চরণে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য উতলা হইয়াছিল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া আমি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি।

নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া ভারতমাতার পদাম্বুজে অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করিব এবং এই আন্তরিক উৎসর্গের ভিতর দিয়া পূর্ণতর জীবন লাভ করিব—এই আদর্শের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত

হইয়াছিলাম। স্বদেশ বা রাজনীতির পর্যালোচনা আমি সাময়িক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করি নাই। এইজন্য পরাধীন দেশে স্বদেশসেবকের জীবনে যে বিপদ ও পরীক্ষা, দুঃখ ও বেদনা অবশ্যম্ভাবী, তাহার জন্য কায়মনে প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি কৃতকার্য হইতে পারিয়াছি কিনা, অথবা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি—তাহার বিচার করিবেন আমার দেশবাসিগণ। আমার ক্ষুদ্র অথচ ঘটনাবহুল জীবনে যে ঝড় আমার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, বিঘ্নবিপদের সেই কষ্টি-পাথর দ্বারা আমি নিজেকে সূক্ষ্মভাবে চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই নিবিড় পরিচয়ের ফলে আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, যৌবনের প্রভাতে যে কণ্টকময় পথে আমি জীবনের যাত্রা শুরু করিয়াছি, সেই পথের শেষ পর্যন্ত চলিতে পারিব; অজানা ভবিষ্যৎকে সম্মুখে রাখিয়া যে-ব্রত একদিন গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা উদ্‌যাপন না করিয়া বিরত হইব না। আমার সমস্ত প্রাণ ও সারা জীবনের শিক্ষা নিঙাড়িয়া আমি এই সত্য পাইয়াছি—পরাধীন জতির সব ব্যর্থ—শিক্ষা, দীক্ষা, কর্ম—সকলই ব্যর্থ, যদি তাহা স্বাধীনতা লাভের সহায় বা অনুকূল না হয়। তাই আজ আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই বাণী নিরন্তর আমার কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে—"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।" আমি কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি—আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন—স্বরাজলাভের পুণ্য প্রচেষ্টাই যেন আমার জীবনের জপ, তপ ও স্বাধ্যায়, আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান হয় এবং জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত আমি যেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নিরত থাকিতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু
(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১। সুভাষচন্দ্র তাঁহার দেশসেবার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে লিখ।

২। লেখক বাঙ্গলা দেশের যে মোহনীর রূপটি প্রকাশ করিয়াছেন, উহা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

৩। অর্থ লিখ :—

জনান্তিক, গতানুগতিক, দেশান্তরিত, আত্মোৎসর্গ, লেখনী, স্বাধ্যায়, জলধি, পদাম্বুজ, কৃতাঞ্জলিপুটে, কষ্টিপাথর।

৪। বাক্য রচনা কর :—

বঞ্চিত, প্রকাশ্যে, কারারুদ্ধ, মোহনীয়, প্রতিভাবান, সাহিত্যিক, প্রকট, অনুভূতি, অনুপ্রাণিত, পরাধীন।

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

"স্বাধীনতা — কে বাঁচিতে — হে — বাঁচিতে — ?"

"স্বপ্ন দিয়ে — সে যে — দিয়ে ঘেরা।"

৬। ব্যাখ্যা কর :—

বাঙ্গলার ········ঘেরা।

৭। নিম্নের বাক্যটির শুদ্ধ শব্দগুলির নীচে দাগ দাও

তবে আমাড় / আমার সান্ত্বনা / সান্তনা ও সৌভাগ্য এই যে আমাড় / আমার কারাবাশ / কারাবাস ব্যর্থ / ব্যার্থ হয় নাই।

৮। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—জনান্তিক, গতানুগতিক, দেশান্তরিত, উল্লেখ, উচ্ছল, আত্মোৎসর্গ, বিদ্যালয়, পদাম্বুজ।

৯। চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর :—

এখানে আসিবার পূর্বে আমি বাঙ্গলাকে, ভারতভূমিকে ভালবাসিতাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদের দরুন সোনার বাঙ্গলাকে, পুণ্য ভারতভূমিকে শতগুণে ভালবাসিতে শিখিয়াছি।

বৃন্দাবন

[পল্লীবাসীদের দ্বেষ, হিংসা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার কিভাবে গ্রামীণ সমাজের সর্বনাশ সাধন করে তাহার একটি বাস্তবচিত্র এখানে আছে। সুবিবেচক, সাহসী সমাজহিতৈষীরা কিরূপ প্রতিকূল পরিবেশে আদর্শের জন্য সংগ্রাম করেন তাহা বৃন্দাবনের চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবহেলিত গ্রামগুলির দুর্দশার চিত্রও গল্পটিতে পাওয়া যায়।]

গ্রামে মহামারী শুরু হইয়া গেল। যাহার পলাইবার স্থান ছিল, সে পলাইল। অধিকাংশেরই ছিল না, তাহারা কহিল,—অন্নজল ফুরাইলেই যাইতে হইবে। পলাইয়া কি করিব ?

বৃন্দাবনের বাড়ির সম্মুখ দিয়াই গ্রামের পথ। তথায় যখন-তখন ভয়ঙ্কর হরিধ্বনিতে ক্রমাগত জানা যাইতে লাগিল, ইহাদের অনেকেরই অন্নজল প্রতিনিয়তই নিঃশেষ হইতেছে। আশেপাশের গ্রামেও দু-একটা মৃত্যুর কথা শুনা যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু 'বাড়লে'র অবস্থা প্রতি-মুহূর্তেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল।

ইহার প্রধান কারণ, গ্রামের অবস্থা অন্যান্য বিষয়ে ভাল হইলেও পানীয় জলের বন্দোবস্ত ছিল না। নদী নাই, যে দুই-চারিটি পুষ্করিণী পূর্বে উত্তম ছিল, তাহাও সংস্কারের অভাবে মজিয়া উঠিয়া প্রায় অব্যবহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অথচ গ্রামবাসীদের কাহারও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র ছিল না ; গ্রামবাসীদের অনেকেরই বিশ্বাস,—জলে তৃষ্ণানিবারণ ও আহার্য পাক করিবার ক্ষমতা থাকা পর্যন্ত তাহার ভালমন্দের দিকে চাহিবার আবশ্যকতা নাই।

এদিকে গোপাল ডাক্তার ছাড়া আর চিকিৎসক নাই। তিনি কাঙালের ঘরে যাইবার সময় পান না। অথচ মড়ক প্রতিদিন বাড়িয়াই

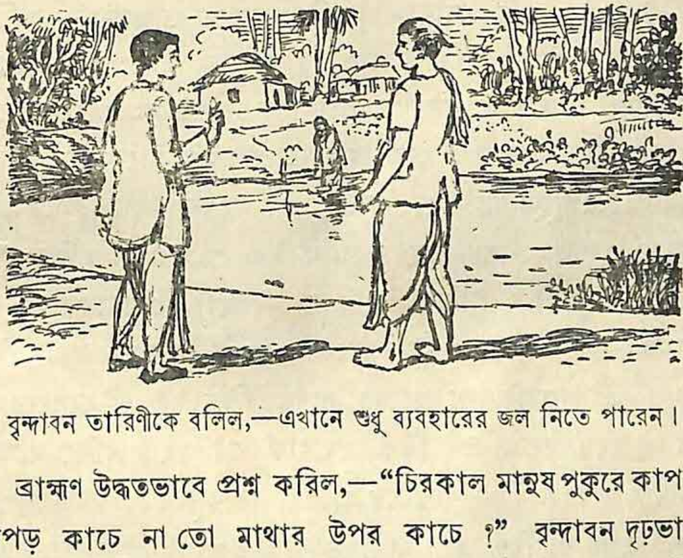
চলিয়াছে। ক্রমশঃ এমন হইয়া উঠিল যে, ঔষধ-পথ্য ত দূরের কথা, মৃতদেহ সৎকার করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। শুধু বৃন্দাবনের পাড়াটাই তখনও নিরাপদ ছিল। বৃন্দাবনের পিতা নিজেদের ব্যবহারের নিমিত্ত যে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন তাহার জল তখনও দূষিত হয় নাই। প্রতিবেশী গৃহস্থেরা এই পানীয় ব্যবহার করিয়াই সম্ভবতঃ এখনো মৃত্যু এড়াইয়াছিল।

এমন সময়ে সে একদিন মায়ের মুখে সংবাদ পাইল, তাহাদের প্রতিবেশী তারিণী মুখুয্যের ছোট ছেলে রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। খবর শুনিয়া তাহার মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল।

তারিণী মুখুয্যের ছোট ছেলে মরিয়াছে। পরদিন সকালবেলা বৃন্দাবন কি কাজে ঐ দিক দিয়া আসিতেছিল—দেখিতে পাইল, তাহাদের পুকুর-ঘাটের উপরেই একটি স্ত্রীলোক কতকগুলি কাপড়-চোপড় কাচিতেছে। কতক কাচা হইয়াছে, কতক এখনও বাকি আছে। বস্ত্রগুলির চেহারা দেখিয়াই বৃন্দাবন শিহরিয়া উঠিল। নিকটে আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "মড়ার কাপড়-চোপড় কি ব'লে আপনি পুকুরে পরিষ্কার করছেন?" স্ত্রীলোকটি ঘোমটার আড়াল হইতে কি বলিল বোঝা গেল না। বৃন্দাবন বলিল, "অন্যায় যা করেছেন, আর-ত তার উপায় নেই ; কিন্তু আর ধোবেন না, উঠে যান।" সে পরিষ্কৃত বস্ত্রগুলি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন জলের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উঠিয়া আসিতেছিল, দেখিল, তারিণী দ্রুতবেগে এইদিকে আসিতেছে। একে পুত্রশোকে কাতর, তাহাতে এই অপমান! আসিয়াই ক্রুদ্ধ-স্বরে বলিল, "তুমি নাকি আমার বাড়ির লোককে পুকুরে নামতে দাওনি?" বৃন্দাবন কহিল, "তা নয়, ময়লা কাপড় ধুতে মানা করেছি।"

তারিণী চেঁচাইয়া উঠিয়া কহিল, "কোথায় ধোব ? থাকব 'বাড়লে' কাপড় ধুতে যাব 'বদ্দিবাটি'তে ? উচ্ছন্নে যাবি, বৃন্দাবন। ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিলে নির্বংশ হ'বি।" বৃন্দাবনের বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল। কিন্তু চেঁচামেচি করা, কলহ করা তাহার স্বভাব নয়, তাই আত্মসংবরণ করিয়া শান্তভাবে কহিল—"আমি একা উচ্ছন্নে যাই তাতে ক্ষতি নেই। পাড়াটা যে উচ্ছন্নে দেবার আয়োজন করেছেন।"



বৃন্দাবন তারিণীকে বলিল,—এখানে শুধু ব্যবহারের জল নিতে পারেন।

ব্রাহ্মণ উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করিল,—"চিরকাল মানুষ পুকুরে কাপড়-চোপড় কাচে না তো মাথার উপর কাচে ?" বৃন্দাবন দৃঢ়ভাবে জবাব দিল,—"এ পুকুর আমার। নিষেধ না শুনলে আপনার বাড়ির কোন লোককে পুকুরে নামতে দেব না।" "নামতে দিবিনে ত আমরা যাব কোথায়, বলে দে ?" বৃন্দাবন কহিল, "এখানে শুধু ব্যবহারের জল নিতে পারেন। কাপড়-চোপড় ধুতে হলে মাঠের ধারে ডোবাতে নিয়ে গিয়ে ধুতে হবে।" তারিণী মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "ছোট-লোক হয়ে তোর এত বড় মুখ ! তুই বলিস মেয়েরা যাবে মাঠে কাপড়

ধুতে ? একলা আমার বাড়িতে বিপদ ঢোকেনি রে, তোর বাড়িতেও ঢুকবে।" বৃন্দাবন তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, "আমি মেয়েদের যেতে বলিনি। আপনার যখন দাসীচাকর নেই, তখন মানুষ হ'ন ত নিজে গিয়ে ধুয়ে আনুন। আপনি এখন শোকে কাতর, আপনাকে শক্ত কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়, কিন্তু হাজার অভিসম্পাত দিলেও আমি পুকুরের জল নষ্ট করতে দেব না।"

আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করিয়া বৃন্দাবন চলিয়া গেল। মিনিট দশেক পরে ঘোষাল আসিয়া সদরে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। তিনি তারিণীর আত্মীয়। বৃন্দাবন বাহিরে আসিতেই বলিলেন, "হ্যাঁ বাপু বৃন্দাবন, তোমাকে সবাই সৎ ছেলে ব'লেই জানে। এ কি ব্যবহার তোমার ? ব্রাহ্মণ পুত্রশোকে মারা যাচ্ছে, তুমি তাদের পুকুর বন্ধ করে দিয়েছ নাকি ?" বৃন্দাবন কহিল, "ময়লা কাপড়-চোপড় ধোয়া বন্ধ করেছি, জল তোলা বন্ধ করিনি।"—"ভাল করনি বাপু, আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি। তোমার মান রেখে ঘাটের উপর না ধুয়ে একটু তফাতে ধোবে।" বৃন্দাবন জবাব দিল, "না। এই পুকুরটি মাত্র গ্রামের সম্বল, কিছুতেই এই দুঃসময়ে এর জল নষ্ট হতে দেব না।" কিন্তু ঘোষাল রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এ তোমার অন্যায় জিদ। শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠা করা পুষ্করিণীর জল কিছুতেই অপবিত্র বা কলুষিত হয় না। দু'পাতা ইংরাজী পড়ে শাস্ত্র বিশ্বাস না করলে চলবে কেন, বাপু।"

বৃন্দাবন এ-কথা একশত বার শুনিতে শুনিতে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, বিরক্ত হইয়া বলিল, "শাস্ত্র আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু মনগড়া শাস্ত্র আমি মানি না। যা' বলছি তাই হবে, ওর জলে ময়লা ধুতে দেব না। আর কেউ হ'লে এ কাপড় পুড়িয়ে ফেলত, কিন্তু আপনারা যখন মায়া ত্যাগ করতে পারবেন না, তখন মাঠের ডোবা

থেকে পরিষ্কার করে আনুন, আমার পুকুরে ওসব চলবে না।” এই বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। এদিকে ঘোষাল মহাশয় বৃন্দাবনের সর্বনাশ কামনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

The story describes the poor condition of our village and teaches hygienic way of living.

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১। ‘বৃন্দাবন’ গল্পটিতে পল্লীবাসীদের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও জাত্যভিমানের ফলে পল্লীবাসীদের দুর্গতির যে-চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে, উহা সংক্ষেপে লিখ।

২। বৃন্দাবনের চরিত্র বর্ণনা কর। সে তাহার পুকুরে কাপড় ধুইতে দেয় নাই কেন?

৩। শব্দার্থ লিখ :

আহার্য, মড়ক, ক্রুদ্ধস্বরে, উচ্ছন্ন, দৃঢ়কণ্ঠে, অভিসম্পাত, কলুষিত।

৪। বাক্য রচনা কর :—

অভিপ্রায়, উপায়, দ্রুতবেগে, আত্মসংবরণ, ডোবা, কামনা।

৫। ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) “আমি একা উচ্ছন্নে······আয়োজন করেছেন।”

(খ) “শাস্ত্র আমি বিশ্বাস······মানি না।”

৬। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—অন্যায়, উচ্ছন্ন।

৭। লিঙ্গান্তর কর :—স্ত্রীলোক, দাসী, মানুষ, চাকর।

৮। চলিত ভাষায় পরিণত কর :—

গ্রামে মহামারী শুরু হইয়া গেল। যাহার পলাইবার স্থান ছিল, সে পলাইল। অধিকাংশেরই ছিল না, তাহারা কহিল,—অন্নজল ফুরাইলেই যাইতে হইবে। পলাইয়া কি করিব?

শক্তু দাতা ব্রাহ্মণ

[বিশুদ্ধ দানই সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য কর্ম। যাহার প্রচুর আছে সে প্রচুর দান করিতে পারে। দানের পরিমাণে শ্রেষ্ঠত্ব হয় না। যে দিনহীন নিজের ক্ষুধার অন্নটি ক্ষুধার্তের মুখে তুলিয়া দেয়, সে-ই শ্রেষ্ঠ দাতা। ক্ষুধায় মানুষ ধর্মজ্ঞান হারায়। সেই ক্ষুধার আক্রমণ এবং পারিবারিক কর্তব্যকে জয় করিয়া ব্রাহ্মণ সংগৃহীত যবের ছাতু ক্ষুধার্ত অতিথিকে দান করিয়া শ্রেষ্ঠ দাতার মর্যাদা লাভ করিয়াছিল।]

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ—সেই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হলে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। মহাদানের ফলে যখন ধর্মরাজের যশ সর্বদিকে ঘোষিত হল এবং আকাশ থেকে তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল, তখন এক বৃহৎ নকুল যজ্ঞসভায় এল। তার চক্ষু নীল ও মস্তক স্বর্ণবর্ণ। ধৃষ্টভাবে বজ্রকণ্ঠে বললে, ওহে নরপতিগণ, কুরুক্ষেত্রবাসী এক উঞ্ছজীবী বদান্য ব্রাহ্মণ যে শক্তুদান করেছিলেন, তার সঙ্গে আপনাদের এই যজ্ঞের তুলনা হয় না।

নকুলের এই কথা শুনে ব্রাহ্মণরা বললেন, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? কেন এই যজ্ঞের নিন্দা করছ?

নকুল হাস্য করে বললে, দ্বিজগণ, আমি মিথ্যা বলিনি, দর্প করেও বলিনি। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক ব্রাহ্মণ কপোতের ন্যায় উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদা দারুণ দুর্ভিক্ষের ফলে তাঁর সঞ্চয় শূন্য হ'য়ে গেলে তিনি অতিকষ্টে কিঞ্চিৎ যব সংগ্রহ ক'রে তা থেকে শক্তু প্রস্তুত করলেন। জপ, আহ্নিক ও হোমের পর ব্রাহ্মণ সপরিবারে ভোজনের উপক্রম করেছেন এমন সময়ে এক ক্ষুধার্ত অতিথি ব্রাহ্মণ এসে আহার চাইলেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অতিথিকে সাদরে পাদ্য

অর্ঘ্য দিয়ে নিজের শক্তুর ভাগ নিবেদন করলেন। অতিথি তা খেলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষুধার নিবৃত্তি হ'ল না। তখন ব্রাহ্মণের পত্নী বললেন, তুমি এঁকে আমার ভাগ দাও।

ব্রাহ্মণ তাঁর ক্ষুধার্ত শ্রান্ত-শীর্ণা বৃদ্ধা পত্নীকে বললেন, তোমার ভাগ আমি নিতে পারি না। কীট-পতঙ্গ-মৃগাদিও নিজের স্ত্রীকে পোষণ করে। ধর্ম-অর্থ-কাম, সংসার-কার্য, সেবা, সন্তানপালন—সবই ভার্যার সাহায্যে হয়, ভার্যাকে পালন না করলে লোকে নরকে যায়। ব্রাহ্মণী শুনলেন না, নিজের শক্তু অতিথিকে দিলেন। অতিথি তা খেলেন; কিন্তু তথাপি তাঁর তৃপ্তি হ'ল না। তখন ব্রাহ্মণের পুত্র তাঁর অংশ দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, পুত্র, তোমার বয়স যদি সহস্র বৎসরও হয় তথাপি তুমি আমার দৃষ্টিতে বালক, তোমার অংশ আমি অতিথিকে দিতে পারব না। ব্রাহ্মণ-পুত্র আপত্তি শুনলেন না, নিজ অংশ অতিথিকে দিলেন। তথাপি তাঁর ক্ষুধা দূর হ'ল না; তখন ব্রাহ্মণের সাধ্বী পুত্রবধূ নিজ অংশ দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, কল্যাণী, তোমার দেহ শীর্ণ ও বিবর্ণ, তুমি ক্ষুধার্ত হয়ে আছ, তুমি অনাহারে থাকবে এ আমি কি করে দেখব? পুত্রবধূ শুনলেন না, অগত্যা ব্রাহ্মণ তাঁর অংশও অতিথিকে দিলেন।

তখন অতিথিরূপী ধর্ম বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তোমার শুদ্ধ দান পেয়ে আমি প্রীত হয়েছি; ওই দেখো, আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে; দেব-গন্ধর্ব-ঋষি প্রভৃতি তোমার দান দেখে বিস্মিত হয়ে স্তব করছেন। ক্ষুধায় প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও ধর্মজ্ঞান নষ্ট হয়, কিন্তু তুমি ক্ষুধা দমন এবং স্ত্রী-পুত্রাদির স্নেহ অতিক্রম ক'রে নিজ কর্ম দ্বারা স্বর্গলোক জয় করেছ। শক্তুদান ক'রে তুমি যে ফল পেয়েছ বহুশত অশ্বমেধে তা হয় না। দিব্যযান উপস্থিত হ'য়েছে, তুমি এতে আরোহণ ক'রে পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত ব্রহ্মলোকে যাও।

অতিথিরূপী ধর্ম এইরূপ বললে ব্রাহ্মণ সপরিবারে স্বর্গে গেলেন। তখন আমি গর্ত থেকে নির্গত হ'য়ে ভূ-লুণ্ঠিত হলাম। সিক্ত শক্তুকণার গন্ধে, দিব্য পুষ্পের মর্দনে এবং সেই সাধু ব্রাহ্মণের দান ও তপস্যার প্রভাবে আমার মস্তক কাঞ্চনময় হ'ল। আমার অবশিষ্ট দেহও ঐরূপ হবে ওই আকাঙ্ক্ষায় আমি তপোবন ও যজ্ঞস্থলে সর্বদা ভ্রমণ করছি। আমি আশান্বিত হয়ে কুরুরাজের এই যজ্ঞে এসেছি, কিন্তু আমার দেহ কাঞ্চনময় হ'ল না। এই কারণেই আমি হাস্য করে বলেছিলাম যে, সেই উঞ্ছজীবী ব্রাহ্মণের শক্তুদানের সঙ্গে আপনাদের এই যজ্ঞের তুলনা হয় না। নকুল এই কথা ব'লে চ'লে গেল।

A tale from Purana which teaches that helping the needy without looking to one's own good is the best virtue:

—রাজশেখর বসু

অনুশীলনী

১। "কুরুক্ষেত্রবাসী এক উঞ্ছজীবী বদান্য ব্রাহ্মণ যে শক্তুদান করেছিলেন তার সঙ্গে আপনাদের এই যজ্ঞের তুলনা হয় না।"—এই উক্তি কে কাহার প্রতি করিয়াছিল? এই উক্তিটি সত্য কিনা লিখ।

২। ব্রাহ্মণ পরিবারের অপূর্ব দান ও ত্যাগের কাহিনী নিজের ভাষায় লিখ।

৩। নকুলের মস্তক কাঞ্চনময় হইয়াছিল কেন এবং কিরূপে? নকুলের অবশিষ্ট দেহ কুরুরাজের যজ্ঞে আসিয়াও কাঞ্চনময় হয় নাই কেন?

৪। শব্দার্থ লিখ:

শক্তু, ধৃষ্টভাবে, অশ্বমেধ যজ্ঞ, বজ্রকণ্ঠ, উঞ্ছজীবী, বদান্য, কপোত, ভার্যা, নকুল, পাদ্য, বিস্মিত, অর্ঘ্য, সাধ্বী, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, কল্যাণী, শীর্ণা, প্রজ্ঞা, দিব্যযান, ভূলুণ্ঠিত, ধর্মরাজ, কীটপতঙ্গ, তপোবন, কাঞ্চনময়।

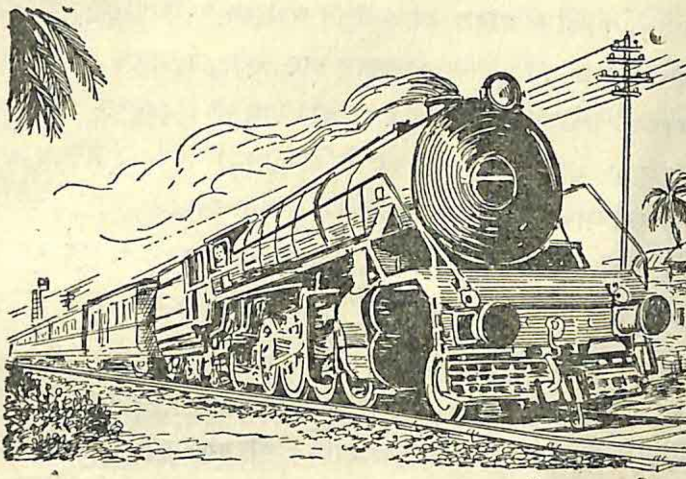
৫। বাক্যরচনা কর:

পুষ্পবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, শক্তু, অনাহারে, প্রীত, সপরিবারে, আশান্বিত।

৬। লিঙ্গান্তর কর: শীর্ণা, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা, পুত্র, সাধ্বী, বালক, পত্নী।

বোলপুর ভ্রমণ

[রবীন্দ্রনাথ যুবাকালে 'জীবনস্মৃতি'তে বাল্যকালের ঘটনা লিখিতে গিয়া বীরভূম জিলার বোলপুরে শান্তিনিকেতনে ভ্রমণের কথা লিখিয়াছেন। পিতার সহিত রেলগাড়ীতে বোলপুর গিয়া তিনি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রকৃতির রাজ্যে শিশু-মনের যে কৌতূহল মিটাইয়াছিলেন সেই অভিজ্ঞতার কথায় রচনাটি রসমধুর।]



বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার সময় পিতা তাঁহার চিররীতি-অনুসারে বাড়ির সকলকে দালানে লইয়া উপাসনা করিলেন, গুরুজনদিগে প্রণাম করিয়া পিতার সহিত গাড়িতে চড়িলাম। আমার বয়সে এই প্রথম আমার জন্য পোশাক তৈরি হইয়াছে। কি রঙের কিরূপ কাপড় হইবে তাহা পিতা স্বয়ং আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। মাথার জন্য একটা জরির-কাজ করা গোল মখমলের টুপি হইয়াছিল। সেটা আমার হাতে ছিল, কারণ নেড়া মাথার উপর টুপি পরিতে আমার মনে মনে আপত্তি ছিল। গাড়িতে উঠিয়াই পিতা বলিলেন, "মাথায় পরো।" পিতার কাছে যথারীতি পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি হইবার জো নাই। লজ্জিত

মস্তকের উপর টুপিটা পরিতেই হইল। রেলগাড়িতে একটা সুযোগ বুঝিলে টুপিটা তুলিয়া রাখিতাম। কিন্তু, পিতার দৃষ্টি একবারও এড়াইত না। তখনই সেটাকে স্বস্থানে তুলিতে হইত।

সত্য বলিয়াছিল, বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে রেলগাড়িতে চড়া এক ভয়ঙ্কর সঙ্কট—পা ফস্‌কাইয়া গেলেই আর রক্ষা নাই। তারপর গাড়ি যখন চলিতে আরম্ভ করে, তখন শরীরের সমস্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া বসা চাই, নহিলে এমন ভয়ঙ্কর ধাক্কা দেয় যে, মানুষ কে-কোথা ছিটকাইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। স্টেশনে পৌঁছিয়া মনের মধ্যে বেশ একটু ভয়-ভয় করিতেছিল। কিন্তু গাড়িতে এত সহজেই উঠিলাম যে মনে সন্দেহ হইল, এখনো হয় তো গাড়ি ওঠার আসল অঙ্গটাই বাকি আছে। তাহার পরে যখন অত্যন্ত সহজে গাড়ি ছাড়িয়া দিল, তখন কোথাও বিপদের একটুও আভাস না পাইয়া মনটা বিমর্ষ হইয়া গেল।

গাড়ি ছুটিয়া চলিল; তরুশ্রেণীর সবুজ-নীল পাড়-দেওয়া বিস্তীর্ণ মাঠ এবং ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি রেলগাড়ির দুই ধারে দুই ছবির ঝরনার মতো বেগে ছুটিতে লাগিল, যেন মরীচিকার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় বোলপুরে পৌঁছিলাম। পালকিতে চড়িয়া চোখ বুজিলাম। একেবারে কাল সকাল বেলায় বোলপুরের সমস্ত বিস্ময় আমার জাগ্রত চোখের সম্মুখে খুলিয়া যাইবে, এই আমার ইচ্ছা—সন্ধ্যার অস্পষ্টতার মধ্যে কিছুকিছু আভাস যদি পাই, তবে কালকের অখণ্ড আনন্দের রসভঙ্গ হইবে।

ভোরে উঠিলাম। বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল, বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

আমরা শহরের ছেলে, কোনোকালে ধানের ক্ষেত দেখি নাই এবং রাখাল বালকের কথা বইয়ে পড়িয়া তাহাদিগকে খুব মনোহর করিয়া

কল্পনার পটে আঁকিয়াছিলাম। সত্যর কাছে শুনিয়াছিলাম, বোলপুরের মাঠে চারিদিকেই ধান ফলিয়া আছে এবং সেখানে রাখাল বালকের সঙ্গে খেলা প্রতিদিনের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। ধানক্ষেত হইতে চাল সংগ্রহ করিয়া ভাত রাঁধিয়া রাখালদের সঙ্গে একত্র বসিয়া খাওয়া এই খেলার প্রধান অঙ্গ।

ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে চাহিলাম। হায় রে, মরুপ্রান্তরের মধ্যে কোথায় ধানের ক্ষেত! রাখালবালক হয়তো-বা মাঠের কোথাও ছিল, কিন্তু তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া রাখাল বালক বলিয়া চিনিবার কোনো উপায় ছিল না।

যাহা দেখিলাম না তাহার খেদ মিটিতে বিলম্ব হইল না—যাহা দেখিলাম তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। এখানে চাকরদের শাসন ছিল না। প্রান্তরলক্ষ্মী দিক্‌চক্রবালে একটিমাত্র নীল রেখার গণ্ডি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অবাধ সঞ্চরণের কোনো ব্যাঘাত করিত না।

যদিও আমি নিতান্ত ছোট ছিলাম, কিন্তু পিতা কখনো আমাকে যথেচ্ছবিহারে নিষেধ করিতেন না। বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষয় করিয়া প্রান্তরতল হইতে নিম্নে লাল কাঁকর ও নানা প্রকার পাথরে খচিত ছোট ছোট শৈলমালা, গুহাগহ্বর, নদী-উপনদী রচনা করিয়া বালখিল্যদের দেশের ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। এখানে এই ঢিবিওয়ালা খাদগুলিকে "খোয়াই" বলে। এখান হইতে জামার আঁচলে নানাপ্রকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া পিতার কাছে উপস্থিত করিতাম। তিনি আমার এই অধ্যবসায়কে তুচ্ছ বলিয়া একদিনও উপেক্ষা করেন নাই। তিনি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "কী চমৎকার! এ-সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে?" আমি বলিতাম, "এমন আরো কত আছে! কত হাজার

হাজার ! আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।” তিনি বলিতেন, “সে হইলে তো বেশ হয়। ওই পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।”

একটা পুকুর খুঁড়িবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত কঠিন মাটি বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই অসমাপ্ত গর্তের মাটি তুলিয়া দক্ষিণ ধারে পাহাড়ের অনুকরণে একটি উচ্চ স্তূপ তৈরী হইয়াছিল। সেখানে প্রভাতে আমার পিতা চৌকি লইয়া উপাসনায় বসিতেন, তাঁহার সম্মুখে পূর্বদিকের প্রান্তসীমায় সূর্যোদয় হইত। এই পাহাড়টাই পাথর দিয়া খচিত করিবার জন্য তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন। বোলপুর ছাড়িয়া আসিবার সময় এই রাশীকৃত পাথরের সঞ্চয় সঙ্গে আনিতে পরি নাই বলিয়া মনে বড়ই দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম।

খোয়াইয়ের মধ্যে এক জায়গায় মাটি চুঁইয়া একটা গভীর গর্তের মধ্যে জল জমা হইত। এই জল সঞ্চয় আপন বেষ্টন ছাপাইয়া ঝির্‌-ঝির্‌ করিয়া বালির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। অতি ছোট ছোট মাছ সেই জলকুণ্ডের মুখের কাছে স্রোতের উজানে সন্তরণের স্পর্ধা প্রকাশ করিত। আমি পিতাকে গিয়া বলিলাম, “ভারি সুন্দর জলের ধারা দেখিয়া আসিয়াছি, সেখান হইতে আমাদের স্নানের ও পানের জল আনিলে বেশ হয়।” তিনি আমার উৎসাহে যোগ দিয়া বলিলেন, “তাই তো, সে তো বেশ হইবে।” এবং আবিষ্কর্তাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য সেইখান হইতে জল আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আমি যখন-তখন সেই খোয়াইয়ের উপত্যকা-অধিত্যকার মধ্যে অভূতপূর্ব কোনো একটা-কিছুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই ক্ষুদ্র অজ্ঞাত রাজ্যের আমি ছিলাম লিভিংস্টোন। এটা যেন একটা দূর-বীনের উলটো দিকের দেশ। নদী-পাহাড়গুলোও যেমন ছোট ছোট, মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ বুনো-জাম, বুনো-খেজুরগুলোও তেমনি বেঁটে-

খাটো। আমার আবিষ্কৃত ছোট নদীটির মাছগুলিও তেমনি, আর আবিষ্কার-কর্তাটির তো কথাই নাই।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Description of journey to Bolpur and love of nature by Rabindra Nath Tagore.

অনুশীলনী

১। বালক রবীন্দ্রনাথের প্রথম রেলগাড়ি চড়ার কাহিনী সংক্ষেপে লিখ।

২। ট্রেনে বোলপুর যাওয়ার সময় রবীন্দ্রনাথ পথিপার্শ্বে যে-দৃশ্য দেখিয়াছিলেন উহার বর্ণনা দাও।

৩। বোলপুরের মাঠে বালক-রবীন্দ্রনাথ যে-সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন উহা বর্ণনা কর।

৪। 'খোয়াই' কাহাকে বলে? রবীন্দ্রনাথ এই খোয়াইয়ের রূপ কিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন?

৫। রবীন্দ্রনাথের পিতা রবীন্দ্রনাথকে ছেলেবেলায় কীভাবে উৎসাহ দিয়াছিলেন?

৬। অর্থ লিখ:

উপাসনা, সঙ্কট, বিমর্ষ, মরীচিকা, খেদ, শৈলমালা, রাশীকৃত, উত্থান, অভূতপূর্ব, নৈমিত্তিক, দিকৃচক্রবাল, উপত্যকা, অধিত্যকা, দূরবীন, অজ্ঞাত, বালখিল্য।

৭। ব্যাখ্যা কর:—

(ক) প্রান্তরলক্ষ্মী……ব্যাঘাত করিত না।

(খ) এই ক্ষুদ্র অজ্ঞাত রাজ্যের……লিভিংস্টোন।

৮। নিম্নের বন্ধনীর শব্দগুলি বাছিয়া যথোপযুক্ত স্থানে বসাইয়া শূন্যস্থান পূরণ কর:—

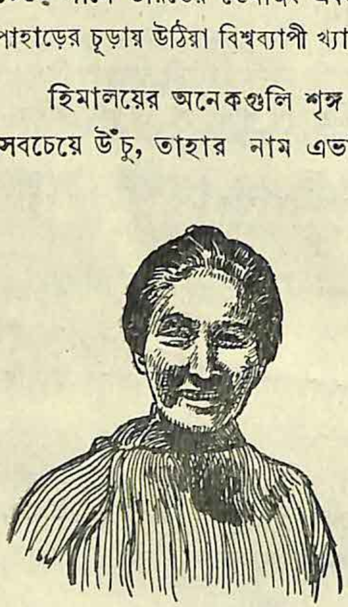
[হইতে, বাড়ির, পিতা, উপাসনা, করিবার, চিররীতি, দালানে।]

বাড়ি—যাত্রা—সময়—তাঁহার—অনুসারে—সকলকে—লইয়া—করিলেন।

এভারেস্ট অভিযান

[হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম এভারেষ্ট। ইহা ২৯ হাজার ফুটেরও বেশী উচ্চ। শৃঙ্গটি সর্বদাই বরফে ঢাকা থাকে। এই শৃঙ্গের চূড়ায় উঠিবার জন্য সুদীর্ঘকাল যাবৎ চেষ্টা করা হয়, বহু দুঃসাহসিক অভিযানকারী মৃত্যুবরণ করে। ১৯৫৩ সালে ভারতের তেনজিং এবং নিউজিল্যাণ্ডের হিলারী প্রাণপণ চেষ্টায় পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।]

হিমালয়ের অনেকগুলি শৃঙ্গ আছে। এই শৃঙ্গগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে উঁচু, তাহার নাম এভারেষ্ট। এই শৃঙ্গটির উচ্চতা উনত্রিশ হাজার একশত একচল্লিশ ফুট; অর্থাৎ পাঁচ মাইলেরও কিছু বেশী। এত উচ্চ শৃঙ্গ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।



তেনজিং

এই শৃঙ্গে আরোহণ করা যে কি ভয়ংকর ব্যাপার, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই শৃঙ্গটির ঊর্ধ্বদেশ চিরতুষারাবৃত। এখানকার বায়ু এত হাল্কা যে, মানুষ নিঃশ্বাস লইতে পারে না, সেইজন্য নাকের কাছে কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক বায়ু সৃষ্টি করিতে হয়। তাহার উপর আবার মাঝে মাঝে তুষার-ঝটিকার উৎপাত আছে। এই তুষার-ঝটিকা একবার বহিতে আরম্ভ করিলে কাহারও নিস্তার নাই। এই ভীষণ ঝটিকা তখন যাহাকে সম্মুখে পাইবে, তাহার উপর রাশি রাশি তুষার বর্ষণ করিতে থাকিবে। এই তুষাররাশির মধ্যে চাপা পড়িয়া মৃত্যু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

কিন্তু এত বিপদ, এত কষ্ট সত্ত্বেও নির্ভীক ভয়শূন্য গিরিপর্যটকের দল এভারেষ্ট-অভিযানে বারবার বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কত ব্যক্তি এই চেষ্টায় প্রাণ দিল, কত ব্যক্তি পথকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া ভগ্নশরীর লইয়া ফিরিয়া আসিল, তথাপি চেষ্টার বিরাম নাই। জীবন ইহাদের নিকট তুচ্ছ।

এভারেষ্টের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠিবার চেষ্টা বহুবার হইয়াছে। এই চেষ্টা যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইউরোপের লোক। প্রথম চেষ্টা হয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রথমবারের দলটি পঁচিশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠিয়া ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পর আবার একবার চেষ্টা হয়। এই দ্বিতীয়বারের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এইবারে অভিযানকারীরা সাতাশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠিতে পারিয়াছিলেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আবার একবার চেষ্টা করা হয়। এই অভিযানের নায়ক হইলেন ম্যালোরি নামক এক ব্যক্তি। ইনি ইহার পূর্বে আরও কয়েকবার বিভিন্ন দলের সহিত এভারেষ্টের চূড়ায় উঠিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং এখানকার পথ-ঘাট এবং হাল-চাল তাহার অনেকটা জানা ছিল। এইজন্য সকলে তাঁহাকে দলের নায়ক করিয়াছিলেন।

ম্যালোরির দল যাত্রা শুরু করলেন। সঙ্গে একদল কুলি চলিল। তাহাদের পিঠে বড় বড় বোঝা। এই বোঝাগুলিতে ছিল তাঁবু, খাদ্যদ্রব্য, কম্বল, নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। সাতাশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠিয়া ইঁহারা তাবু খাটাইলেন। সাতাশ হাজার ফুটের তাঁবু হইতে এভারেষ্টের চূড়া মাত্র দুই হাজার ফুট। কিন্তু এই দুই হাজার ফুট উঠাই ভীষণ ব্যাপার। এখানে তুষার-ঝটিকা রাতদিন প্রায় লাগিয়া আছে।

স্থির হইল ম্যালোরি ও আরভিন চূড়ায় উঠিবেন, আর অন্য সকলে পঁচিশ হাজার ফুটের তাঁবুতে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবেন।

ম্যালোরি ও আর্‌ভিন যাত্রা শুরু করিলেন। চূড়ায় পৌছিতে আর বোধ হয় ছয় শত ফুট মাত্র বাকি। এবার তাঁহাদের জয় সুনিশ্চিত। ওডেল প্রভৃতি উৎসাহে ও আনন্দে প্রায় পাগলের মত হইয়া উঠিলেন।

এই ছয়শত ফুট তাঁহারা আর অতিক্রম করিতে পারিলেন না। ম্যালোরি ও আর্‌ভিনের এই যাত্রাই শেষ যাত্রা হইল। এভারেষ্টের তুষাররাশির মধ্যে তাঁহাদের দেহ কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, তাহা গিরিরাজ হিমালয়ই কেবল বলিতে পারেন।

ইহার পর ১৯৩৩/৩৬/৩৯/৫১ সালে যে-সকল অভিযান হয়—সেগুলিতে ২৮ হাজার ফুটের উর্ধ্বে অভিযাত্রীরা উঠিতে পারেন নাই। ১৯৫২ সালের অভিযানে তেনজিং ও ল্যাম্বেয়ার নামে একজন সুইস ২৮,৫৫০ ফুট পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। তারপর ১৯৫৩ সালে তেনজিং ও নিউজিল্যাণ্ডের হিলারী কর্নেল হাণ্টের নেতৃত্বে অভিযান করিলেন। এই দলে ১৩ জন বৃটিশ অভিযাত্রী ছিল। সঙ্গে ছিল ৩৬৩ জন ভারবাহী কুলি। ২০ জন দিশারী আগে আগে চলিল।

২৮ হাজার ফুট পর্যন্ত অধিকাংশ অভিযাত্রীই উঠিলেন—এখন বাকি থাকিল এক হাজার ফুট। দলের নেতা হাণ্ট সাহেব হিলারী ও তেনজিংকে পাঠাইলেন ঐ এক হাজার ফুট উঠিয়া বহু বৎসরের প্রয়াসকে সফল করিবার জন্য। তেনজিং সহকারী ও দিশারী হইয়া পূর্বে অনেক অভিযানেই সঙ্গী ছিলেন, তাঁহার অভিজ্ঞতা বহুদিনকার।

এভারেষ্টের এই অংশে কোথাও একটু পাথর দেখা যায় না। সমস্ত চূড়াটিই কঠিন বরফের আচ্ছাদনে আবৃত। কোথাও পা রাখিবার জায়গা নাই। তাঁহারা কুড়াল দিয়া বরফের গায়ে খাঁজ কাটিয়া পা

রাখিবার ধাপ বানাইয়া লইতে লাগিলেন। এইরূপ এক ধাপে দাঁড়াইয়া আবার কুড়াল চালাইয়া নূতন ধাপ বানাইতে লাগিলেন—এইভাবে প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁহারা অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিশ্রামের উপায় নাই, অথচ শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন।

অবশেষে তাঁহারা ২৯শে মে তারিখে এভারেষ্টের চূড়ায় উঠিয়া সমগ্র পৃথিবীর পানে সগৌরবে দৃষ্টিপাত করিলেন। তেনজিং রাষ্ট্রসংঘ, বৃটেন, ভারত ও নেপালের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করিলেন। মানুষের সঙ্গে হিমালয়ের মহাসংগ্রাম শেষ হইল।

তারপর নামিবার পালা। ওঠার চেয়ে নামা আরও কঠিন। জয়গৌরব দুইজনকে দ্বিগুণবলে বলীয়ান করিল। সুখের বিষয় ঐ গৌরব তাঁহাদের ধীরতা নষ্ট করে নাই। আবার কুড়াল দিয়া তুষার সরাইতে সরাইতে তাঁহারা ধীরে ধীরে মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে নামিতে লাগিলেন। তাহারা যখন নীচের ছাউনীতে নামিয়া আসিলেন তখন জয়কোলাহলে বিরাট হিমালয় কম্পিত হইয়া উঠিল। সেখানে ত ফুলের মালা ছিল না—সঙ্গীরা নিজ নিজ বাহুর মালা দুইজনের গলায় পরাইয়া দিলেন। তারপর সমতলে নামিয়া এই বিজয়ী বীরদ্বয় দিগ্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডার, সিজার ও নেপোলিয়ানের চেয়ে বোধ হয় অধিক সম্মান লাভ করিয়াছেন।

—বিশ্বপতি চৌধুরী

Adventure of mountaineering teaching bravery & mental strength.

অনুশীলনী

১। হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গের নাম কি? ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। ম্যালোরি ও আরভিনের অভিযানের পরিণতি কি হইল?

৩। তেনজিং কিভাবে এভারেষ্টের চূড়ায় উঠিলেন?

৪। এভারেষ্ট নামক চূড়ায় আরোহণ করিবার অসুবিধা কি কি ?

৫। অর্থ বল :

ভয়ঙ্কর, তুষারাবৃত, ঝটিকা, নির্ভীক, গিরিপর্যটক, দিশারী, রাষ্ট্রসঙ্ঘ, সমতল, অভিযাত্রী, প্রোথিত, গিরিরাজ, সুইস, বৃটিশ, প্রয়াস।

৬। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) এভারেষ্টের……বলিতে পারেন।

(খ) অবশেষে তাঁহারা……দৃষ্টিপাত করিলেন।

(গ) তারপর সমতলে……লাভ করিয়াছেন।

৭। বাক্য রচনা কর :—

শৃঙ্গ, অভিযান, চূড়া, নায়ক, সুনিশ্চিত, সগৌরবে, নির্ভীক, বিজয়ী।

৮। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—

হিমালয়, তুষারাবৃত, সর্বোচ্চ।

৯। লিঙ্গান্তর কর :—

সঙ্গী, নায়ক, পাগল, গিরিরাজ, বিজয়ী।

১০। নিম্নলিখিত অংশ হইতে বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদগুলি বাছিয়া বাহির করিয়া পৃথক ভাবে দেখাও :—

এই ভীষণ ঝটিকা যখন যাহাকে সম্মুখে পাইবে, তাহারই উপর রাশি রাশি তুষার বর্ষণ করিতে থাকিবে। এই তুষাররাশির মধ্যে চাপা পড়িয়া মৃত্যু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

নিউটন

[আইজাক নিউটনের বাল্যজীবনেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার নেশা প্রকাশ পায়। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সময় তিনি মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির রহস্য আবিষ্কার করেন। গাছ হইতে ফল পড়ে পৃথিবীর টানে। সেই টানেই চন্দ্র-গ্রহটি পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। সৌরমণ্ডলের গ্রহ-উপগ্রহগুলিও সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে সর্বক্ষণ ঘুরিতে থাকে। বিজ্ঞান-জগতে নিউটনের এই আবিষ্কার বিস্ময়কর। তাঁহার 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থখানি বিজ্ঞানীর মহামূল্য সম্পদ।]

তুমি গল্প শুনিতে ভালবাস। এস, আজ তোমায় একটা পুরানো গল্প বলি।

প্রায় তিন শত বৎসর হইল, খ্রীষ্টের জন্মদিনে, ইংলণ্ডের এক গ্রামে এক ছেলের জন্ম হয়। ছেলেটা এমন রোগা যে, যাহারা ডাক্তার ডাকিতে গেল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া ছেলেটাকে বাঁচিয়া থাকিতে দেখিবে এমন আশা রইল না। ছেলেটা কিন্তু বাঁচিল।

বাঁচিল, বড় হইল, পাঠশালায় গেল। পাঠশালায় কিন্তু ছেলেটা ল্যাটিন ব্যাকরণে মোটেই মন দেয় না, বড় অন্যমনস্ক থাকে, সমপাঠী-দের মধ্যে অধম বলিয়া খ্যাত হইল। পড়িতে চায় না; ঘুড়ি তৈয়ার করে; জলে, বাতাসে ছোট ছোট চাকা ঘুরায়, ঘুড়ির লেজে কাগজের লণ্ঠন ঝুলাইয়া দেয়।

ছেলের বয়স পনর বৎসর হইল। লেখাপড়া হইল না, তাই তাঁর মা নিজের জমি-জায়গা দেখিতে ছেলেটাকে নিযুক্ত করিলেন। পাঠশালা ছাড়িয়া ছেলেটা খুব খুশী বটে, কিন্তু ছেলেটা একই রকমের রহিল। চাকরের সঙ্গে ক্ষেতের ফসল বেচিতে হাটে যাইবার কথা; কিন্তু ছোঁড়াটা ঘরে লুকাইয়া হয়ত কেবল পড়ে, নয়ত হাটে যাইবার পথের

ধারে আপন মনে বসিয়া কত কি কল তৈয়ার করে। ছোঁড়াটা খেলায় বড়ই পটু।

ছোঁড়াটা কোন কাজেরই হইল না। মা বিরক্ত। মামার কাছেও গুণাগুণ অজানা রহিল না। সে চাষবাস করিতে পারিল না। তাই মামার পরামর্শে তাহাকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে পাঠান হইল। ছোঁড়াটার নাম আইজাক নিউটন।

এইবার আইজাক নিউটন কঠিন গবেষণায় মগ্ন হইলেন। গাছ হইতে একটা ফল পড়িল। ঢিল, ফল, শূন্য হইতে চিরদিনই পড়ে। আমরা নিত্য দেখি। সেকালের লোকেরাও, শুধু এদেশের নয়, সকল দেশেরই—ঢিল, ফল পড়িতে দেখিত এবং পতনকে আকর্ষণও বলিত। এটা নূতন কথা নয় ; সবাই জানে, সবাই জানিত। নূতন কথা এই, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে কেবল কি ঢিল, ফলই পড়ে, না চাঁদও পড়ে ? পৃথিবীর উপর একটা ঢিল সোজা ছুঁড়িয়া দিলে তাহা বক্রপথে ভূমিতে পতিত হয়। পৃথিবীর টানে চাঁদও কি পৃথিবীর দিকে সেই রকম পড়িতেছে ?

পৃথিবী চাঁদকে কত বলে টানিতেছে, নিউটন গণনা করিতে বসিলেন। যদি গণনার সহিত প্রত্যক্ষ ফল মিলে, তবেই ঠিক ; চন্দ্রও পড়ে।

তাইত। চাঁদটা পৃথিবীর দিকে মিনিটে ১৬ ফুট পড়িতেছে। কিন্তু মোটামুটি হিসাব এক কথা, সমুদয় সূক্ষ্মরূপে ঐক্য করা আর এক কথা। স্থূল গণনার ১৬ ফুট আসিলে কি হয় ? সমুদয় মিলিলে তবে পৃথিবীর আকর্ষণেই চাঁদের পড়া ঠিক, নইলে নয়।

নিউটনের আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল। দিনের পর দিন তিনি কি করিতেছেন, জ্ঞান রহিল না। খাবার জিনিস কাছে না ধরিলে খাওয়ার কথাই মনে হয় না।

এই সময়ের ঘটনা বলি। একদিন তাঁহার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে আসেন। বন্ধুটি দেখিলেন নিউটনের খাবার একপাশে ঢাকা আছে, নিউটন সংজ্ঞাহীন। বন্ধুটি খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন, তিনি যে আসিলেন, নিউটন দেখিয়াও দেখেন নাই। নিউটন কতদূর বাহ্যজ্ঞানহীন, তাহা দেখিবার জন্য বন্ধুটি নিউটনের খাবার খাইয়া থালাখানি আগের মত ঢাকিয়া রাখিলেন। কতক্ষণ পরে নিউটনের চেতনা হইল। তিনি বন্ধুকে দেখিয়া তাহার সমাদর করিলেন, পরে খাইতে বসিলেন। ঢাকনাটি খুলিয়া উচ্ছিষ্ট দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য! আমি কখন খেয়েছি! মনে হচ্ছিল যে খাই নাই।"

এইরূপ একাগ্রতার মাঝে নিউটনের প্রথম গ্রন্থ লিখিত হয়—যে গ্রন্থের জন্য নিউটন অমর হইয়াছেন। প্রগাঢ় চিন্তায় তাঁহার মাথা গরম হইল, কিছুদিনের জন্য পাগলামির ছিটও দেখা গেল।

এখন ভাবিয়া দেখ, কত মূল্য দিয়া আধুনিক বিজ্ঞান "প্রিন্সিপিয়া" পাইয়াছে? নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি সমগ্র বিশ্বের বস্তুগুলির মধ্যেই যে আকর্ষণ চলিতেছে তাহার রহস্যও আবিষ্কার করিয়াছেন। সকলে জানিত যে, এই মাধ্যাকর্ষণ-বল বশতঃ ফল পড়ে, কিন্তু জানিত না যে, তারই টানে চাঁদও পড়ে, এবং পড়ে বলিয়াই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, সোজা পথে চলিয়া যাইতে পারে না। জানিত না, সূর্যেরও মাধ্যাকর্ষণ-বল আছে, যাহার জন্য গ্রহগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। নিউটন দেখাইয়া দিয়াছেন, যে-বলের প্রভাবে চন্দ্র স্বীয় কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে, সেই বলেই শূন্যস্থিত লোষ্ট্রও ভূতলে পড়িতেছে।

—যোগেশচন্দ্র রায়

(সংক্ষেপিত)

Biography of Newton
teaching his discovery.

অনুশীলনী

১। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাহাকে বলে ?

২। নিউটন আমাদের নূতন কি জ্ঞানের সন্ধান দিয়াছেন ?

৩। "প্রিন্সিপিয়া" সম্বন্ধে কি জান ? নিউটনের আত্মভোলা জ্ঞানসাধনার একটি দৃষ্টান্ত দাও।

৪। অর্থ বল :—

অন্যমনস্ক, পটু, পরামর্শ, বক্রপথে, প্রত্যক্ষ, বশতঃ, প্রদক্ষিণ, স্বীয়, লোষ্ট্র, উচ্ছিষ্ট, সংজ্ঞাহীন।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

পৃথিবীর — চাঁদও কি — দিকে সেই — পড়িতেছে ?

৬। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) সেকালের লোকেরাও····· আকর্ষণ বলিত।

(খ) নিউটন দেখাইয়া দিয়াছেন······ভূতলে পড়িতেছে।

৭। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—

গুণাগুণ, মাধ্যাকর্ষণ, উচ্ছিষ্ট, বিদ্যালয়।

৮। নিম্নলিখিত বাক্যটির মধ্যে হইতে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদগুলি বাছিয়া বাহির কর :—

প্রগাঢ় চিন্তায় তাঁহার মাথা গরম হইল, কিছুদিনের জন্য পাগলামির ছিটও দেখা গেল।

৯। নিম্নলিখিত শব্দগুলি দ্বারা পৃথক পৃথক বাক্য গঠন কর :—

রোগা, সমপাঠী, অজানা, প্রত্যক্ষ, সমুদয়, মোটামুটি।

স্বদেশ প্রেমের আদর্শ

['আনন্দমঠ' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র দেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসীদের জীবনধর্মের আদর্শ রূপায়িত করিয়াছেন। এই ধর্মের নাম সন্তানধর্ম। দেশমাতাকে পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশে কঠোর ব্রত পালন করিতে হইবে, সর্বত্যাগী হইতে হইবে, ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি ও সামাজিক জাতিসংস্কার ত্যাগ করিয়া দেশের সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিতে হইবে।]



বঙ্কিমচন্দ্র

সত্যানন্দ কথাবার্তা শেষ করিয়া মহেন্দ্রের সহিত সেই মঠস্থ দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্তি বিরাজিত। সেখানে তখন অপূর্ব শোভা। রাশি রাশি পুষ্প মন্দির আমোদিত করিতেছিল। মন্দিরে আর একজন উপবেশন করিয়া মৃহু মৃহু "হরে মুরারে" শব্দ করিতেছিল। সত্যানন্দ মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র সে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দীক্ষিত হইবে ?"

সে বলিল, "আমাকে দয়া করুন।"

তখন তাহাকে ও মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা এই ভগবৎ সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর, সন্তানধর্মের নিয়ম সকল পালন করিবে।"

উভয়ে—করিব।

সত্য—যতদিন না মাতার উদ্ধার হয় ততদিন গৃহধর্ম পরিত্যাগ করিবে ?

উভয়ে—করিব।

সত্য—পিতামাতা ত্যাগ করিবে ?

উভয়ে—করিব।

সত্য—ভ্রাতা-ভগিনী ?

উভয়ে—ত্যাগ করিব।

সত্য—দারাসুত ?

উভয়ে—ত্যাগ করিব।

সত্য—আত্মীয়-স্বজন ? দাসদাসী ?

উভয়ে—সকলই ত্যাগ করিলাম।

সত্য—ধন—সম্পদ—ভোগ ?

উভয়ে—সকলই পরিত্যাজ্য হইল।

সত্য—ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর, আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জন করিবে না। যাহা উপার্জন করিবে তাহা বৈষ্ণব-ধনাগারে দিবে।

উভয়ে—দিব।

সত্য—সনাতন ধর্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে ?

উভয়ে—করিব।

সত্য—রণে কখনও ভঙ্গ দিবে না ?

উভয়ে—না।

সত্য—যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় ?

উভয়ে—জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষপান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব।

সত্য—আর এক কথা,—জাতি। তোমরা কি জাতি? মহেন্দ্র কায়স্থ জানি। অপরটি কি জাতি?

অপর ব্যক্তি বলিল,—"আমি ব্রাহ্মণ-কুমার।"

সত্য—উত্তম। তোমরা জাতি ত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কি বল?

উভয়ে—আমরা সে বিচার করিব না, আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্য—তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে-সকল প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারি স্বয়ং ইহার সাক্ষী। যিনি ইন্দ্রের বজ্রে ও মার্জারের নখে তুল্যরূপে বাস করেন, তিনি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করিয়া অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন।

উভয়ে—তথাস্তু।

সত্য—তোমরা গাও, "বন্দে মাতরম্"।

(মাতৃস্তোত্র গীত হইল)

ব্রহ্মচারী তখন তাহাদিগকে যথারীতি দীক্ষিত করিলেন।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১। সন্তানধর্মের শর্তগুলি কি?

২। অর্থ লিখ :—দারাসুত, রণ, মুরারি, স্তোত্র, শোভা, গাত্রোত্থান, অর্থোপার্জন, তুল্য, মার্জার।

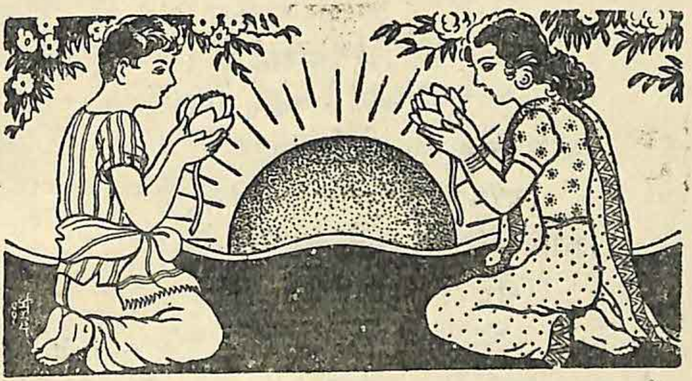
৩। ব্যাখ্যা কর :—"সকল সন্তান একজাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নাই।"

৪। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—অর্থোপার্জন, ধনাগার, মহেন্দ্র, মুরারি, তথাস্তু।

A shortened piece from "Anandamat teaching patriotism and national integration.

পদ্যাংশ

প্রার্থনা



[ভগবানের নিকট প্রার্থনা। ভগবান যেন আমাদের মনের কালিমা পাপে মতি এবং সুখভোগের হীন ইচ্ছা দূর করেন—আমরা যেন ভগবানকে এই বিচিত্র সৃষ্টির সর্বত্র প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই।]

তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে ;
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক্ মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্
অকূল গরল-পাথারে।

প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হন্তা,
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণ-তলে নিয়ে এস মোর
মত্ত বাসনা গুছায়ে।
আছ অনলে-অনিলে, চির নভোনীলে,
ভূধরে-সলিলে-গহনে,
আছ বিটপী-লতায়, জলদের গায়,
শশী-তারকায় তপনে।
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া,
ব'সে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া,
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

—রজনীকান্ত সেন

A prayer in general for mental development.

অনুশীলনী

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। ব্যাখ্যা লিখ : "আছ অনলে-অনিলে···শশী-তারকায় তপনে।"

৩। অর্থ বল : গরল, বিশ্ব-বিপদ-হন্তা, অনলে-অনিলে, নভোনীলে, ভূধরে-সলিলে, বিটপী-লতায়, জলদ, শশী, তপন, লক্ষ্য, লক্ষ।

৪। বাক্য রচনা কর :—
নির্মল, কালিমা, পন্থা, অনল, অনিল, প্রভু, শশী।

———

গুরুভক্তি

[যথার্থ জ্ঞান শুধু শাস্ত্রপাঠ দ্বারা অর্জন করা যায় না। গুরুর প্রতি অকুণ্ঠ ভক্তি এবং গুরুর আদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিলেই নিখিলের সর্বশাস্ত্রে জ্ঞানার্জন হয়। মহাভারতের আরুণির উপাখ্যানে গুরুভক্তির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে।]

আরুণি নামেতে শিষ্য ছিল একজন।
গুরু তাকে ডাকি' দিলা আদেশ-বচন,—
"ধান্যক্ষেত্র হতে জল বাহিরিয়া যায়,
যত্ন করি আলি বাঁধি' রাখ গিয়া তায়।"
আজ্ঞা পেয়ে গেল শিষ্য পরম আহ্লাদে ;
সর্ববিদ্যা শিখিয়াছে গুরু-আশীর্বাদে ;
গিয়া দেখে যত জল যায় বেগভরে ;
করিল যতন বহু আলি বাঁধিবারে।
কাটিয়া বিস্তর মাটি সেইখানে ফেলে,
রাখিতে না পারে মাটি, অতি বেগ জলে।
জল বহি' যায় গুরু পাছে রোষ করে—
আপনি শুইল শিষ্য বাঁধের উপরে।
সমস্ত দিবস গেল আইল রজনী ;
না আইল শিষ্য, গুরু চলিলা আপনি।
ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া ডাক দিল গুরুবর ;
শিষ্য বলে,—"শুয়ে আছি আলির উপর।
বহু যত্ন করিনু, না রহিল বন্ধন ;
আপনি শুইনু বাঁধে তাহার কারণ।"

শুনিয়া বলিল গুরু—"আইস উঠিয়া।"
উঠি' শিষ্য গুরুপদে প্রণমিল গিয়া।
আশীর্বাদ দিল গুরু,—"হউক কল্যাণ
নিখিলের সর্বশাস্ত্রে হোক তব জ্ঞান।"

—কাশীরাম দাস

অনুশীলনী

১। আরুণির অপূর্ব গুরুভক্তির পরিচয় দাও।

২। অর্থ বল :—ধান্যক্ষেত্র, আলি, আজ্ঞা, বিস্তর, রোষ, রজনী, কল্যাণ।

৩। ব্যাখ্যা কর :—

আশীর্বাদ······তব জ্ঞান।

৪। নিম্নের বাক্যটিতে বিশেষ্য পদ বাহির কর :—

আরুণি নামেতে শিষ্য ছিল একজন।

The piece teaches devotion to teachers helping pupils in their development.

সুখ

[কবিতাটির মধ্যে পরার্থে আত্মোৎসর্গের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। কেবল দুঃখের আগুনে পুড়িবার জন্য এই পৃথিবীতে মানুষের জন্ম হয় নাই। সংসারের বিরাট কর্মক্ষেত্রে সংগ্রাম করিয়া যাহারা জয়ী হয়, পরার্থে যাহারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে, পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য যাহারা তৎপর, তাহারাই পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ অনুভব করিতে পারে।]

নাই কি রে সুখ ? নাই কি রে সুখ ?
এ ধরা কি শুধু বিষাদময় ?
যাতনে জ্বলিয়া কাঁদিয়া মরিতে
কেবলি কি নর জনম লয় ?
কাঁদাতেই শুধু বিশ্ববিধাতা
সৃজেন কি নরে এমনি ক'রে—
মায়ার ছলনে উঠিতে পড়িতে
মানব-জীবন অবনী 'পরে ?
কার্যক্ষেত্র ওই প্রশস্ত পড়িয়া
সমর-অঙ্গন সংসার এই—
যাও বীরবেশে কর গিয়া রণ,
যে জিনিবে, সুখ লভিবে সেই।
পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও ;
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরের কারণে মরণেও সুখ,
সুখ সুখ করি কেঁদো না আর
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।
'বিষাদ' 'বিষাদ' 'বিষাদ' বলিয়ে
কেনই কাঁদিবে জীবন ভরে ?
মানবের মন এত কি অসার,
এতই সহজে নুইয়ে পড়ে ?
সকলের মুখ হাসিভরা দেখে
পার না মুছিতে নয়ন-ধার ?
পরহিত ব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদ-ভার ?
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

—কামিনী রায়

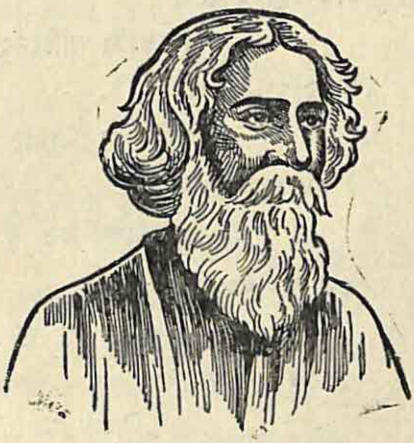
অনুশীলনী

১। 'সুখ' কবিতাটির সারাংশ লিখ।
২। ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) পরের কারণে……হৃদয়-ভার।
(খ) আপনারে লয়ে বিব্রত…আমরা পরের তরে।
৩। শব্দার্থ লিখ :—
যাতনে, বিশ্ববিধাতা, স্বজেন, স্বার্থ, বিষাদ, বিব্রত, অবনী।

The piece teaches selfsacrifice.

পূজার সাজ

[ভিক্ষার দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহাতে মানুষের কোন গৌরব নাই। পরের অনুগ্রহে প্রাপ্ত মূল্যবান পূজার সাজের তুলনায় দরিদ্র পিতার আদরের পূজার সাজ অনেক বেশী মূল্যবান ও গৌরবের। আত্ম-মর্যাদা সম্বন্ধে যে সচেতন, সে কখনও ভিক্ষার দান গ্রহণ করিয়া খুশী হইতে পারে না।]



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি,
পূজার সময় এল কাছে ;
মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই,
আনন্দে দু'হাত তুলি নাচে।
সবুর সহে না আর জননীরে বার বার
কহে, 'মাগো, ধরি তোর পায়ে,
বাবা আমাদের তরে কি কিনে এনেছে ঘরে
একবার দে না, মা, দেখায়ে !'
ব্যস্ত দেখি' হাসিয়া মা দু'খানি ছিটের জামা
দেখাইল করিয়া আদর।
মধু কহে, 'আর নেই ?' মা কহিল, 'আছে এই
একজোড়া ধুতি ও চাদর !'

রাগিয়া আগুন ছেলে কাপড় ধুলায় ফেলে
কাঁদিয়া কহিল, 'চাহি না মা,
রায়বাবুদের গুপি পেয়েছে জরির টুপি,
ফুলকাটা সাটিনের জামা।'
মা কহিল, 'মধু, ছি ছি, কেন কাঁদ মিছামিছি,
গরিব যে তোমাদের বাপ,
এবার হয়নি ধান, কত গেছে লোকসান,
পেয়েছেন কত দুঃখ তাপ।
তবু দেখ বহু ক্লেশে তোমাদের ভালবেসে
সাধ্যমত এনেছেন কিনে!
সে জিনিস অনাদরে ফেলিলি ধূলির 'পরে
এই শিক্ষা হ'ল এতদিনে?'
বিধু বলে, 'এ কাপড় পছন্দ হয়েছে মোর,
এই জামা পরাও আমারে।'
মধু শুনে আরও রেগে ঘর ছেড়ে দ্রুতবেগে
গেল রায়বাবুদের দ্বারে।
সেথা মেলা লোক জড়ো, রায়বাবু ব্যস্ত বড়,
দালান সাজাতে গেছে রাত;
মধু যবে এক কোণে দাঁড়াইলে ম্লান মনে
চোখে তাঁর পড়িল হঠাৎ।
কাছে ডাকি' স্নেহ-ভরে কহেন করুণ স্বরে
তারে দুই বাহুতে বাঁধিয়া—
'কিরে মধু হয়েছে কি, তোরে যে শুকনো দেখি।'
শুনি' মধু উঠিল কাঁদিয়া;—

কহিল, 'আমার তরে বাবা আনিয়াছে ঘরে
শুধু এক ছিটের কাপড়।'
শুনি রায় মহাশয় হাসিয়া মধুরে কয়,
সে-জন্য ভাবনা কিরে তোর!'
ছেলেরে ডাকিয়া চুপি কহিলেন, 'ওরে গুপি,
তোর জামা দে ত' তুই ওরে।'
গুপির সে জামা পেয়ে মধু ঘরে যায় ধেয়ে,
হাসি আর মুখে নাহি ধরে।
বুক ফুলাইয়া চলে, সবারে ডাকিয়া বলে,
'দেখ কাকা, চেয়ে দেখ মামা।
ওই আমাদের বিধু ছিট পরিয়াছে শুধু,
মোর গায়ে সাটিনের জামা।'
মা শুনি, কহেন আসি' লাজে অশ্রুজলে ভাসি'
কপালে করিয়া করাঘাত —
'হই দুঃখী হই দীন, কাহারো করি না ঋণ,
কারো কাছে পাতি নাই হাত।
তুমি আমদেরি ছেলে ভিক্ষা লয়ে অবহেলে
অহঙ্কার কর ধেয়ে ধেয়ে,
ছেঁড়া ধুতি আপনার ঢের বেশী দাম তার
ভিক্ষা করা সাটিনের চেয়ে।
আয় বিধু আয় বুকে, চুমো খাই চাঁদমুখে
তোর সাজ সবচেয়ে ভালো
দরিদ্র ছেলের দেহে দরিদ্র বাপের স্নেহে
ছিটের জামাটি করে আলো।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

One brother begs costly dress and the other is satisfied with the simple dress bought by his father. Begging

অনুশীলনী

১। মধু ও বিধুর মধ্যে কাহাকে তোমার ভাল লাগে ?

২। মা বিধুকে আদর করিয়া কোলে করিলেন কেন এবং মধুকেই বা তিরস্কার করিলেন কেন ?

৩। 'পূজার সাজ' কবিতাটি পড়িয়া কি উপদেশ পাইলে ?

৪। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) ছেঁড়া ধুতি……সাটিনের চেয়ে।

(খ) আয় বিধু……আলো।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

ছেঁড়া — আপনার, — বেশী — তার, ভিক্ষা — সাটিনের —।

৬। অর্থ লিখ :—

সবুজ, জরি, সাটিন, ক্লেশ, অনাদর, পছন্দ, দ্রুতবেগে, লাজে, করাঘাত, দীন, চাঁদমুখ।

বঙ্গভূমির প্রতি

[জননী বঙ্গভূমির প্রতি কবির আকুল প্রার্থনা। কবি মধুসূদন বিলাতে যাত্রার কিছুদিন আগে জন্মভূমিকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন যে, বিদেশে যাইয়া যদি দৈবাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটে তাহাতে দুঃখ নাই, কারণ মানুষের মৃত্যু একদিন হইবেই ; কিন্তু জননী জন্মভূমি যদি কবিকে স্মরণে রাখেন, তাহা হইলে মরিয়াও তিনি অমর হইবেন।]



মহাকবি মধুসূদন দত্ত

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে ;
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন ক'রো না গো, তব মনঃ-কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হ'বে,
অমর কে কোথা কবে ?
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবন-নদে !
কিন্তু যদি রাখ মনে ;
নাহি মা, ডরি শমনে ;

মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজনে ;
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে ?
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সু-বরদে ।
ফুটি যেন স্মৃতি জলে,
মানসে মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস, কি বসন্তে, কি শরদে ।

Prayer to motherland for being immortal.

—মধুসূদন দত্ত

অনুশীলনী

১। কবিতাটির ভাবার্থ লিখ।

২। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) জন্মিলে মরিতে……জীবন-নদে !

(খ) সেই ধন্য……সর্বজনে।

(গ) ফুটি যেন……শরদে।

৩। শব্দার্থ লিখ :—

মিনতি, কোকনদে, বশে, নীর, শমন, মক্ষিকা, হ্রদ, নিত্য, যাচিব, অমরতা, শ্যামা, জন্মদে, বরদে, তামরস।

বাঙলা দেশ

[সকলেই মাতৃভূমিকে ভালবাসে, মাতৃভূমির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়, মাতৃভূমির গৌরবে উল্লসিত হয়। বাঙালী কবি বাংলা দেশের গাছপালা, ফুলফল, বাঙলার পাখি, বাংলা ভাষা এবং বাংলার কবিদের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙলার সুখদুঃখের সঙ্গে দেশপ্রেমিক কবি একাত্মবোধ করিয়াছেন।]

কোন্ দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই
দলতে হয় রে দূর্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাঙলা দেশ,
আমাদেরি বাঙলা রে।
কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা,
ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে,
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাঙলা দেশ,
আমাদেরি বাঙলা রে।

কোন্ ভাষা মরমে পশি
আকুল করি তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুনতে পাব
বাউল সুরের মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের—রামপ্রসাদের
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে,
সে আমাদের বাঙলা দেশ,
আমাদেরি বাঙলা রে।
কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা
সবার অধিক পাই রে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়
বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃ-পিতামহের
চরণ ধূলি কোথা রে ?
সে আমাদের বাঙলা দেশ,
আমাদেরি বাঙলা রে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অনুশীলনী

১। বাঙলা দেশের বিশেষত্ব বর্ণনা কর।

২। শব্দার্থ লিখ :—

তরু, কমল, শ্যামা, চাতক, মরম, দুর্দশা, শ্যামল, ফিঙে, মরাল, বাউল।

৩। টীকা লিখ :—চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, বাউল সুরের মধুর গান।

৪। লিঙ্গান্তর কর :—মরাল, চাতক, শ্যামল, পিতামহ।

৫। কবিতাটিতে যে পাখিগুলির উল্লেখ আছে তাহাদের পরিচয় দাও।

Description of Bengal teaching patriotism.

চল্ চল্ চল্

[তরুণেরা সাহস ও আশা বুকে বাঁধিয়া সর্বদা আগাইয়া চলে। কবি তাহাদের সব বাধা অতিক্রম করিয়া মৃত্যুভয় ত্যাগ করিয়া নবজীবন প্রতিষ্ঠার জন্ম অগ্রসর হইবার আহ্বান জানাইয়াছেন।]



কাজী নজরুল ইসলাম

চল্ চল্ চল্।

ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
        চল্ রে চল্ রে চল্
        চল্ চল্ চল্॥

ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
        বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
        বাহুতে নবীন বল।

চল্ রে নও-জোয়ান,
শোন্ রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।
ভাঙ্ রে ভাঙ্ আগল,
চল্ রে চল্ রে চল্।
চল্ চল্ চল্॥

—কাজী নজরুল ইসলাম

অনুশীলনী

১। 'চল্ চল্ চল্' কবিতার মধ্য দিয়া কবি নও-জোয়ানদের উপলক্ষ্য করিয়া কি বলিয়াছেন?

২। সরলার্থ লিখ :—

চল্ রে……জীবনের আহ্বান।

৩। অর্থ লিখ :

গগন, বাদল, ধরণী, অরুণ, তিমির, বিন্ধ্যাচল, নও-জোয়ান, মৃত্যু-তোরণ।

---

call to youths for bringing new life.

মঙ্গল-দূত

[নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যে চিকিৎসক টাকা না পাইলে রোগী দেখে না, যে শিক্ষক টাকা ছাড়া ছাত্র পড়ায় না, সে মানুষের কর্তব্য করে না। জগতের মঙ্গল করাই বিধাতার দূতের নির্দেশ।]

গ্রামের প্রান্তে ফেলেছিল তাঁবু বেদে দুই ভাই আসি,
দিনের বেলায় নাচাত ভালুক, রাত্রে বাজাত বাঁশী।
গভীর রাত্রে সহসা ধরিল ওলাওঠা এক ভা'য়,
সাথী ভাই গেল ডাক্তার-বাড়ী একলা ফেলিয়া তা'য়।
ডাক্তার কহে, "রাত্রি দুপুরে কিছুতে পারি না যেতে,
কয় টাকা দিবি? অগ্রিম চাই", বলে সে হাতটি পেতে।
বেদে কহে কেঁদে', "দিতে না পারিব এক টাকা ছাড়া কিছু,"
দুয়ার-গোড়ায় রহিল দাঁড়ায়ে মাথাটি করিয়া নীচু।
ডাক্তার কহে, রাত্রি দুপুরে জ্বালাতে আস্‌লি হেন
অনেক হাতুড়ে রয়েছে বাজারে ডাক দিয়ে নে' না কেন?
সাতদিন গত কেউটিয়া সাপে সেদিন গভীর রাতে—
ঐ ডাক্তার বাবুর ছেলেরে দংশিল ডান হাতে।
পিতার বিদ্যা সব হ'ল সারা, সবার চেষ্টা শেষ,
দেশের ওঝায় ঘুচাতে নারিল কালের গরললেশ।
নীল হ'য়ে গেল দেহটি তাহার শায়িত তুলসীতলে,
নাড়ীর স্পন্দ হইল বন্ধ সবে 'হরি' 'হরি' বলে।
হেন কালে সেই বেদে দুইজন উপজিল সেই ঠাঁয়ে,
চেষ্টাটি করিবে তাহারা কহিল ছেলের মায়ে।

মন্ত্র পড়িল, জলপড়া দিল, আরো কি করিল কত,
ফিরিল জীবন, মেলিল নয়ন, বিষদোষ হ'ল গত।
ডাক্তার বেদেরে জোড়হাতে কয়, "যাহা চাও তাই দিব,
সন্তানে মোর দিয়েছ জীবন, চরণের ধূলি নিব।"
বেদে কহে, "বাবু, শুভ মঙ্গল, সুমতি তোমার হোক্,
কিছুই নিব না, এমনি করিয়া ঘুরি মোরা তিন লোক।
মোরা বিধাতার মঙ্গল-দূত বেদে-বেশে ফিরি দোঁহে,
ভ্রান্তি অন্ধে দেখায়ে পন্থা চেতনা বিতরি মোহে।
বিপদে পড়িয়া ছল করে ডাকি, না ডাকিতে করি ত্রাণ,
জীবজগতের ধ্রুবমঙ্গল শুভ ফল করি দান।"
এত কহি সেই দুই ভবঘুরে আঁধারে মিলাল ছলি,
নির্বাক সবে, আঁখি পালটিতে কোন্ দিকে গেল চলি।

—কালিদাস রায়

অনুশীলনী

১। কবিতাটির শিরোনামার সার্থকতা বিচার কর।
২। কবিতাটির কাহিনী নিজের ভাষায় লিখ।
৩। ব্যাখ্যা কর :—
(ক) মোরা···মোহে।
(খ) বিপদে···চলি।
৪। অর্থ লিখ :—
ওলাওঠা, হাতুড়ে, দংশিল, বদ্যি, গরল, নয়ন, ভবঘুরে, আঁধারে।
৫। নীচের পঙ্‌ক্তিটির প্রত্যেকটি পদের পরিচয় দাও :—
"গভীর রাত্রে সাহসা ধরিল ওলাওঠা এক ভা'য়।"

Doing good to others in a selfless manner is the teaching of this poem

ডাকার মতো ডাক

[মন্দিরে মসজিদে গিয়া ভগবানকে ডাকিতে হয়। কিন্তু কেহ যদি সংসারের কাজের মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করে, মন্দিরে যাইতে না পারে, তাহা হইলেও ভগবান তাহার ডাকে সাড়া দেন। সেই ডাকই ডাকার মতো ডাক যাহাতে ঈশ্বরের প্রতি অকুণ্ঠ ভক্তি প্রকাশ পায়।]

মায়ে ঝিয়ে দুইজনে গোবর কুড়ায়ে ফিরে
বৃদ্ধ গোপ শায়িত শয্যায় ;
অবসর নাই তিল, খাটে দোঁহে নিশিদিন
দরিদ্রের বিশ্রাম কোথায় ?
গোবরের ঝুড়ি মাথে ফিরে যবে গ্রাম পথে
দেবালয়ে নিনাদে কাঁসর ;
ক্ষণেক নামায়ে ঝুড়ি বলে দোঁহে কর জুড়ি
"ডাকিতে দিলে না অবসর।"
প্রণমি হতাশ মনে ফিরি যায় গৃহপানে—
ডেকে বলে মন্দিরের শাঁখ,
"ভেবোনা দুঃখিনী তুমি, শুনিবেন অন্তর্যামী
প্রথমেই তোমাদের ডাক।"

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

অনুশীলনী

১। মা ও মেয়ে কেন হতাশ মনে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল ?

২। শব্দার্থ লিখ :—
মায়ে-ঝিয়ে, সন্ধ্যায়, নিনাদে, কাঁসর, শাঁখ, অন্তর্যামী।

৩। ব্যাখ্যা কর :—
"ভেবো না······তোমাদের ডাক।"

৪। সন্ধিবিচ্ছেদ কর : দেবালয়, ক্ষণেক, হতাশ।

The poem teaches that temples or mosques are not essential for remembering G

ভীষ্মলোচনের গান

[খেয়ালী মানুষের খেয়াল অপরের কাছে কিরূপ বিরক্তিকর তাহার কৌতুক-চিত্র এখানে ব্যক্ত হইয়াছে। ভীষ্মলোচনের গানে সকলে বিভ্রান্ত। ছাগলের শিংয়ের গুঁতায় গান থামিলে সকলের শান্তি।]

গান ধরেছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা—
আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা দিল্লী থেকে বর্মা !
গাইছে ছেড়ে প্রাণের মায়া, গাইছে জোরে প্রাণপণ—
পাগল হয়ে ছুটছে মানুষ, ঘুরছে মাথা ভন-ভন।
বাঁধন ছেঁড়া মহিষ-ঘোড়া পথের ধারে চিৎপাত ;
ভীষ্মলোচন গেয়েই চলে, নাহিক তাহে দৃক্‌পাত।
জলের প্রাণী অবাক মানি' গভীর জলে চুপচাপ ;
গাছের বংশ ধ্বংস হল, পড়ছে ভেঙে ঝুপঝাপ।
শূন্য মাঝে পাখনা ভেঙে উলটে পড়ে পক্ষী,
সবাই বলে—"আর না দাদা, গানটা থামাও লক্ষ্মী।"
এক যে ছিল পাগলা ছাগল—সেটা বড়ই ওস্তাদ ;
গানের তালে শিঙ বাগিয়ে মারল আঘাত পশ্চাৎ।
আর কোথা যায়, এক আঘাতে ভীষ্মলোচন জব্দ ;
প্রাণের ভয়ে ছুটে পালায় ভীষণ যে গান স্তব্ধ।

—সুকুমার রায়

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ বল।

২। ভীষ্মলোচন কিরূপ গান গাহিত ? ইহার ফল কি হইয়াছিল ?

৩। শব্দার্থ লিখ :

আওয়াজ, ধ্বংস, ওস্তাদ, জব্দ, স্তব্ধ।

Sense of humours of Sukumar
• Roy is depicted in this poem

সবার আমি ছাত্র

[পৃথিবীটা চিরকালের শিক্ষালয় এবং মানুষমাত্রই আজীবন ছাত্র। সকলেই বিধাতার সৃষ্টি হইতে সারাজীবন শিক্ষা পাইতে পারে। আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, বন, সূর্য, চন্দ্র সকলেই বিশ্ব-পাঠশালার নিত্যকালের শিক্ষাগুরু।]

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
    উদার হ'তে ভাইরে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
    বায়ুর কাছে পাইরে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান—
হই যেন ভাই মৌন মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে—
    দিল্‌খোলা হই তাইরে।
সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়
    আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখালো হাসতে মেদুর,—
    মধুর কথা বলতে।
ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর—
    অন্তর হউক রত্ন-আকর।
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
    আপন বেগে চলতে।
মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
    পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হ'তে
    পাষাণ দিল দীক্ষা।

ঝরণা তার সহজ গানে
গান জাগালো আমার প্রাণে,
শ্যাম বনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা।
বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর
সবার আমি ছাত্র
নানান্ ভাবে নূতন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।
এই ধরণীর বিরাট খাতায়,
পাঠ্য যে-সব পাতায় পাতায়,
শিখছি সে-সব কৌতূহলে—
সন্দেহ নেই মাত্র॥

—সুনির্মল বসু

অনুশীলনী

১। 'সবার আমি ছাত্র' কবিতাটি হইতে কি শিক্ষা লাভ করা যায়?

২। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়……আপন বেগে চলতে।

(খ) বিশ্বজোড়া……সন্দেহ নেই মাত্র।

৩। "নানান্ ভাবে নূতন জিনিস শিখছি দিবারাত্র।" কবি কি কি শিখিয়াছেন তাহা লিখ।

৪। সন্ধি কর :

শুভ+উপদেশ, রত্ন+আকর, দেশ+অন্তর।

৫। অর্থ লিখ :—মৌন, দিল্‌খোলা, মন্ত্রণা, মেদুর, আকর, সহিষ্ণুতা, বনানী, কৌতূহল।

The poem teaches that the nature
of this universe is our teacher